স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭৪ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ১১ এপ্রিল, ২০২২।। ২৭ চৈত্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

শুভ নববর্ষ

বাঙ্গলার নবজাগরণ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১১ এপ্রিল - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘পাচার-বঙ্গে’ সততার নত মুখ মমতা
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ইমরান খান খান ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

‘হিন্দুত্ব’ শব্দের উদ্ভাবক ছিলেন শ্রীচন্দ্রনাথ বসু
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৮

রাজা শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক
◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১১

অনন্ত সাগরের বুকে কত যে তরঙ্গ
◻ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ◻ ১৫

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে বাঙ্গালির রেনেসাঁ
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২১

সাক্ষাৎকার : বাংলা নববর্ষের ধরন পালটালেও উৎসব একই থাকবে : রঘু রায় ◻ ২৩

নববর্ষ : পথ হারানোর মধ্যেই পথের দিশা
◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৪

সাক্ষাৎকার : নব আনন্দে জাগো আজি
◻ নিজস্ব প্রতিনিধি ◻ ২৭

বেড়ার ওপারে অবমানিত বাঙ্গালিয়ানা
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৮

মহাবীর জয়ন্তী হোক আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতির দিন
◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৩১

অধ্যাত্ম মননে নববর্ষের আহ্বান
◻ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ ◻ ৩৫

উনিশ শতকের বাঙ্গলায় নব জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ◻ অভিমন্যু গুহ ◻ ৩৭

পাঁচ লক্ষের মুক্তি হলো, অপেক্ষমাণ দেড় কোটি
◻ বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ৪৩

চিরবসন্তের অগ্রদূত, হে পয়লা বৈশাখ
◻ সুবল সরদার ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ◻ অঙ্গনা : ৪২

প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গরমকালে সুস্থ থাকবেন কীভাবে

গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। এইসময় বাড়ির বাচ্চা তো বটেই, বয়স্করাও নানারকম অসুখ-বিসুখে ভোগেন। প্রচণ্ড দাবদাহে সাধারণ সর্দিকাশি, জ্বর, পেটের গোলমাল, বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে শুরু করে সানস্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় গরমকালে সুস্থ থাকার নিদান নিয়ে আলোচনা করবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ। কী ধরনের খাবার খাবেন এই বিষয়ে থাকবে পুষ্টিবিদের পরামর্শ। থাকবে শিশুদের অসুখ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে শিশু চিকিৎসকের মতামত।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নূতন বৎসরে আন্তরিক অভিনন্দন

আরও একবার বেলা ফুরাইয়া আসিল। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যে'কয়টি দিন অবশিষ্ট রহিয়াছে এক্ষণে তাহারা ফেলিয়া রাখা কাজগুলি কোনোওক্রমে সাঙ্গ করিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। অন্যদিকে অভ্রংলিহ ধ্বজোত্তোলন করিয়া নব বৈশাখের রথ ছুটিয়া আসিতেছে বাঙ্গালির দ্বার প্রান্তে। বাঙ্গালির মনে নবীন প্রত্যাশা জাগাইতে তাহার জুড়ি নাই। সে বলিতে চাহে, পুরাতন বৎসরে যাহা হয় নাই এইবার তাহা হইবে। তমসাচ্ছন্ন জীবনের রন্ধ্রপথে আসিয়া উপস্থিত হইবে নবীন সূর্যালোক। শতধাজীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া এবং নিয়ত দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ বাঙ্গালি যে সোনার বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখিতেছে, নব বৈশাখের নবীন প্রভাত তাহাকে পূর্ণতা প্রদান করিবে।

কিন্তু সত্যই কি তাহা ঘটিবে? সত্যই কি নূতন বৎসরে এমন কিছু হইবে যাহা বাঙ্গালির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিতবাহী? একদা বাঙ্গালি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিল। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে একটি জোরালো বিশ্বাস প্রতিস্থাপন করিতে পারিয়াছিল যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করা যায়। প্রয়োজন শুধু একটি দরদ-ভরা হৃদয়ের। একটি মেরুদণ্ডের। এবং প্রয়োজন দেশকে একটিবার মা বলিয়া ডাকিবার। বাঙ্গালি তাহা করিয়াছিল। তাহাকে সহোদর ভ্রাতার সহমর্মিতায় অনুসরণ করিয়াছিল মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব। শুধুই কি রাষ্ট্রবিপ্লবে? বাঙ্গালি তাহার যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছিল সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পকলায়, প্রযুক্তিতে, অধ্যাত্ম ভাবনায়, বাণিজ্যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ এমনকী খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গও দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। সারা দেশের মানুষ তৎকালে কলকাতায় আসিত কর্মের সন্ধানে। অবাঙ্গালি ছাত্র কলকাতার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইলে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া ধরা হইত।

দুর্ভাগ্যবশত বাঙ্গালির সেই সোনার দিন আর নাই। এক্ষণে বেশিরভাগ বাঙ্গালি মেধার পরাকাষ্ঠা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অমুক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কী বলিয়াছেন, তমুক বিষয়ে স্বামীজী কী মন্তব্য করিয়াছেন ইত্যাদিতে তাহার মেধা সগৌরবে ব্যয়িত হইতেছে। তাহার নিজের ভাবনার ভাণ্ডারে যে টান পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। মনীষীদিগের বাণী স্মরণ করা দোষণীয় নহে, কিন্তু একশ্রেণীর আপন মস্তিষ্কের দ্বারে তালা ঝুলাইয়া শুধুমাত্র মহাজন বাণী বিতরণ করিয়া যদি আত্মোন্নতির পথ সুগম করা যাইত তাহা হইলে সকলে তাহাই করিত। কিন্তু বাঙ্গালি ভিন্ন কেহই তাহা করে না। এক্ষণে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী দলীয় রাজনীতির বিদুষক হইয়া শাসকের অন্যায়ে মাথা নাড়িয়া সায় দেন। শাসকের বিরুদ্ধ পক্ষের রক্তে বঙ্গভূমি কর্দমাক্ত হইলেও তাঁহারা কৌরব সভায় ভীষ্ম-দ্রোণাদির মতো মৌন রহিয়া কুলবধূর বস্ত্রহরণ দেখিতে থাকেন। সাধারণ বাঙ্গালির কথা আর কী বলা যাইবে! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে পাঁচশত টাকা সরকারি ভাতা পাইবার আশায় লাইনে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। উপযুক্ত বয়স না হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া যে উচিত নহে, এই শিশুবোধ্য কথাটিও তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। বুঝাইবার নিমিত্ত সরকারকে কন্যাশ্রী নামক প্রকল্পনার ছদ্মবেশে উৎকোচ প্রদান করিতে হয়। গড়পড়তা বাঙ্গালি এখন আপাদমস্তক দুর্বৃত্তায়িত। তাহারা মন্দিরে দুর্বৃত্ত, পূজামণ্ডপে দুর্বৃত্ত। ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্ত। বাণিজ্যলক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। সরস্বতীও তাহার উপর প্রসন্ন নহেন। নেতির রাজনীতির সম্মোহনে একদা বাঙ্গালি তাহার বহু প্রজন্মের সাধনার ধন রাষ্ট্রবোধকে উপেক্ষা করিয়াছিল। অধুনা সেই উপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া তাহাকেই রসাতলে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমতাবস্থায় আবার একটি নূতন বৎসর আসিতেছে। এই সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালিকে তাহার গরিমাময় অতীতটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। একমাত্র পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেই বাঙ্গালি এই অন্ধকার চোরাগলি হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবে। আশা করা যায় তাহা অর্ধ শতাব্দীর গ্লানি মুছাইয়া নূতন দিগন্তের সন্ধান দিবে। সবাইকে জানাই নূতন বৎসরের আন্তরিক অভিনন্দন।

সুভাষিতম্

উত্তমস্য ক্ষণং কোপো মধ্যস্য প্রহরদ্বয়ম্।

অধমস্য ত্বহোরাত্রং পাপিষ্ঠ সদা ভবেৎ।।

উত্তম স্তরের মানুষের ক্রোধ ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়, মধ্যম স্তরের মানুষের দুই প্রহর স্থায়ী হয়, অধমদের একদিন-রাত্রি স্থায়ী হয় এবং অত্যন্ত পাপী মানুষের ক্রোধ চিরস্থায়ী হয়।

‘পাচার-বঙ্গে’ সততার নত মুখ মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আচার্য চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন—‘প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্।/নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানান্তু প্রিয়ং হিতম্।।’ —অর্থাৎ প্রজার সুখেই রাজার সুখ। নিজের সুখে নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গিয়েছেন ‘ধর্মায় রাজ্য ভবতি ন কামকরণায় তু’— রাজধর্মের কর্তব্যপালনের সঙ্গে স্বেচ্ছারিতার সম্পর্ক নেই। করলে পতন অনিবার্য। সামনেই রাজ্য শিল্প সম্মেলন। আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সংখ্যাধিক্যের জন্য বিজেপির প্রয়োজন বাড়তি ৯১৯৪ ভোট। বিজেপি আর সহদল মিলে রয়েছে ৫,৩৭,১২৬ মূল্যের ভোট। প্রয়োজন ৫,৪৬,৩২০ ভোট। মোট মূল্য ১০,৯৮,৯০৩ ভোট। মমতার অভ্যর্থনায় প্রধান অতিথি হয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামপুরহাট নরহত্যার পর খানিকটা চিন্তিত প্রধানমন্ত্রী। কানাঘুষো চলছে তিনি ‘ভারচুয়াল’ উদ্বোধন করবেন। ততদিনে আসানসোল লোকসভা আর বালিগঞ্জ বিধানসভার ফল প্রকাশ হয়ে যাবে। বিজেপি আসানসোলে জিতলে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি একরকম। হারলে অন্যরকম। সম্মেলন নিয়ে রাজ্যের শিল্পমহলে রটেছে যে তাজপুর বন্দর আর খোলামুখ খনি দেউচা পাচামিতে বড়ো লগ্নি আসবে। বাম-কংগ্রেস হঠকারিতা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ‘সততার প্রতীক’ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন ছিলেন ‘মিস্টার ক্লিন’ রাজীব গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী হয়ে একটি মেয়াদের পরেই তার ভরাডুবি হয়।

২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে সততার ফসল তোলেন মমতা। দশ বছর শাসনের পর তাঁর সততার প্রতীক ফিকে হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। অথচ রাজ্যের ৪৯ শতাংশ মানুষ তার সঙ্গে। গ্রামবাঙ্গলার ৭৫ শতাংশ (১৫৬-র মধ্যে ১১৭) আর শহর আর আধা শহরের ৭২ শতাংশ আসন (১৩৬-এর মধ্যে ৯৭টি আসন) তার দখলে। এরপরেও মারদাঙ্গা করে তার দলকে জিততে হয়েছে ১০৮ পৌরসভায় আর কলকাতা-সহ ৫ করপোরেশনে। পড়ে থাকা ৩০ শতাংশ আসনকে বিরোধী শূন্য করতে চান মমতা। এক ফর্মূলা ব্যবহার করে উৎপাটিত হয় সিপিএম। ২৩৫ আসন থেকে তারা ৪০-এ নেমে আসে। ২০২১-এর ভোটের পর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এ রাজ্যের বামপন্থী আর কংগ্রেস দল। নিজেদের গোষ্ঠী লড়াই মেটাতে গিয়ে বিজেপি সে পথেই পা বাড়িয়েছে। আপাতত বিজেপির একটাই লক্ষ্য আসানসোল নির্বাচন জেতা। এককেন্দ্রিক বাম আর কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা। মমতা মানতে নারাজ রাজনৈতিক বিরোধিতাই গণতন্ত্রের মন্দির। যেনতেন প্রকারে তিনি মুছে দিতে চান সে বিরোধিতা। সব শাসকের এক মুখ, এক ভাষা। নিম্ন মেধার শাসকরা সর্বদাই বেশি ক্ষমতার জন্য লালায়িত।

> “২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোট। তাতেই বোঝা যাবে মমতা সততার নত মুখ না আজও তিনি সততার প্রতীক। গ্রামবাঙ্গলায় এখন একটাই আবেদন ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটের দুঃস্বপ্ন যেন ফিরে না আসে।”

তাই তারা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী। মমতার দলের নিচুতলার ‘কেষ্ট-বিষ্টুরা’ এখন সব মাতব্বর। তাদের শিক্ষা দিতে সাতদিনের মধ্যে মমতাকে দুবার দল পুনর্গঠন করতে হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভাইপোকে এক সপ্তাহের ভিতর ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। দলের বৃদ্ধ চক্রকে আটকাতে মমতা তা করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার পরিবার এখন কেন্দ্রীয় তদন্তের নিশানায়। কিছু অকিঞ্চিৎ তর্জন গর্জন ছাড়া রহস্যজনক ভাবে মমতা কিন্তু নিশ্চুপ। ১৯৭৭-এ লোকসভা ভোটে পরাজয়ের পর ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে লেখা হয় ‘তেলে আর ছেলে ইন্দিরাকে খেলে’। যুব কংগ্রেসি মমতা তখন ২২ বছরের। আজ মমতা ৬৮। আর তাকে নিয়ে বলা হচ্ছে ‘ভাই-ভাইপোতেই মমতা ফেঁদে। ছাড়বেন গদি অনেক কেঁদে’। ফুটবল ক্লাবের দখল নিয়েও মমতার পরিবারের দিকে আঙুল উঠছে। রাজনৈতিক মহলের আড়ালে আবডালে পশ্চিমবঙ্গকে অনেকেই ঠাট্টা করে ‘পাচার-বঙ্গ’ বলে ডাকতে শুরু করেছেন। তাদের কথায় রাজ্য রাজনীতির মার্কার গোরু, কয়লা, বালি পাচার। অর্থাৎ শাসক দলের জনপ্রতিনিধিদের মানুষ সন্দেহের চোখে দেখছেন। তৃণমূল আর মমতার দল নেই। পালটে গিয়ে হয়ে উঠেছে ‘ভাদু-সোনা-কেষ্টর’ দল যাদের গুহাগৃহের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে ‘মাছের মুড়োর পচন আজ সমস্ত মাছের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৩-শের পঞ্চায়েত ভোট। তাতেই বোঝা যাবে মমতা সততার নত মুখ না আজও তিনি সততার প্রতীক। গ্রামবাঙ্গলায় এখন একটাই আবেদন ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটের দুঃস্বপ্ন যেন ফিরে না আসে। ■

ইমরান খান খান

খেলোয়াড়েষু ইমরান খান,

আপনাদের এবং আপনার দেশের ব্যাপার-স্যাপার আমি ঠিক বুঝি না। তাই সম্বোধন করতে পারলাম না ঠিক মতো। আপনি কোন পদে আছেন, কতদিন থাকবেন কিছুই যে নিশ্চিত নয়। শুধু একটা বিষয়ই নিশ্চিত যে আপনারা ভারতবিরোধী সাতে-পাঁচে না থাকলেও ভারতের নামে গালমন্দ করে টিকে থাকার লড়াই-ই পাকিস্তানের ইতিহাস।

আপনি ক্ষমতায় এসে অন্যরকম কিছু বলেছিলেন। মনে পড়েছে, ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম টেলিভিশন বক্তৃতায় আপনি বলেছিলেন, 'ভারত যদি আমাদের দিকে এক ধাপ এগিয়ে আসে, আমরা তাদের দিকে দুই ধাপ এগোব।' কিন্তু আপনার জমানায় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক মোটেও ভালো করতে পারেননি। আসলে আপনিও জঙ্গিদের নিয়েই টিকতে চেয়েছিলেন। ভারতের থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পেলেও মনে মনে শত্রুই থেকে গিয়েছেন। শেষবার টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টার মধ্যেই গত ৩১ মার্চ আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং আপনার বিরোধীরা দেশের সার্বভৌমত্ব বেচার চক্রান্ত করছে অভিযোগ তুলতে গিয়ে কৌশলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকে ইশারা করেছেন আপনি। এক ভারতীয় সাংবাদিকের বইয়ের উদাহরণ তুলে বলেন, 'ওই বইয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে লেখা আছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ নেপালে গোপন বৈঠক করেছেন।' ঘটনাচক্রে, আপনার বিরুদ্ধে পাক পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল নওয়াজের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ)। প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হিসেবে উঠে আসছিল নওয়াজের ভাই শাহবাজের নামও। আর মোদীর উপরে আপনার রাগ তো থাকবেই। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ঘা যে শুকায়নি। জীবনেও শুকাবে না।

ক্রিকেট মাঠে বরাবর নায়োকচিত ছিলেন আপনি। অনেকেই ভুল ভেবেছিলেন যে, রাজনীতিতেও আপনি

নায়কের মতো আসবেন, দেখবেন, জয় করবেন। কিন্তু পাক রাজনীতির মঞ্চে খেলাটা যে অন্যরকম সেটা বুঝতে বুঝতেই প্রায় দেড় দশক কাটিয়ে ফেলেন আপনি। খাবি খেতে হয়েছে বারবার। ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, মোল্লাবাদ-সহ নানা রোগে ভরা পাক রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে যে মেপে পা ফেলা উচিত, তা সেটাই পারেননি আপনি। তবে কাজের কাজ না করে ভারতের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টাটা চালিয়ে গিয়েছেন। সরকারে সেনাবাহিনী, আইএসআই-এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন আবার তলে তলে যোগাযোগও রেখেছেন।

আসলে ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতা তেমন কাজে লাগেনি আপনার রাজনৈতিক জীবনে। আপনার আমলেই পাক ক্রিকেট বাহিনী জনপ্রিয় করে ফেলে রিভার্স সুইং। পা কাঁপত অনেক ঘাঘু ব্যাটসম্যানেরও। বল ভিতর দিকে ঢুকবে না বাইরের দিকে যাবে বুঝতে বুঝতেই উইকেট চলে যেত। ক্রিকেট ব্যাকরণ বলে, খেলা অনেকটা গড়ালে, বল অনেকটা পুরনো হলে তবেই তাকে রিভার্স সুইঙে বাধ্য করা যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তখতে থাকার টানটান ম্যাচটা বেশিদূর গড়ালই না! ফলে রাজনীতির খেলায় মাঠের রিভার্স সুইঙের জোর দেখাতে পারলেন না। আর 'নো বল' ডাকার জন্য আম্পায়ারই তো রইলেন না। ম্যাচ কঠিন বুঝে 'ফেয়ার প্লে'র তোয়াক্কা না করে আগেভাগে অ্যাসেমব্লি ভেঙে দিয়েছেন। একের পর এক 'নো বল' করে গিয়েছেন।

পাকিস্তানে পুরো মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারা প্রধানমন্ত্রীর তালিকা দীর্ঘ। কেউই পারেননি। আপনিও পারলেন না। তবে আপনি ২২ গজের মতো রাজনীতিতেও খেলোয়াড়ই রয়ে গেলেন। সেই খেলার অঙ্গ হিসেবে যাওয়ার সময়েও ঠারেঠোরে ভারতের দিকে আঙুল তুলে গেলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দিকেও। একবার আয়নার সামনে দাঁড়ান ইমরান। পাশে একটা নরেন্দ্র মোদীর ছবি রাখুন। বুঝতে পারবেন ফারাকটা। □

‘হিন্দুত্ব’ শব্দের উদ্ভাবক ছিলেন শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বাঙ্গালি সাহিত্যিক শ্রীচন্দ্রনাথ বসু ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি হিন্দুত্ব শব্দটি তৈরি করেছিলেন এবং তাঁকে বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক জাতীয়তার অগ্রদূত গণ্য করা হয়।

চন্দ্রনাথ বসুর প্রথম দিকের রচনাগুলো ছিল ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ দ্য ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যখন চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইলের পর্যালোচনা করলেন তখনই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম তাঁর সাহিত্য প্রতিভা লক্ষ্য করলেন; আর বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশেই চন্দ্রনাথ বাংলায় লেখালেখি শুরু করলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের বিখ্যাত পত্রিকা বঙ্গদর্শনে যোগ দিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রায়শই ব্রাহ্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন; এমনকী অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের স্কটিশ নবজাগরণ তাঁর ভালো না লাগলেও স্বল্পকাল তাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং সেই বুদ্ধিজীবীদের থেকে ব্যাপকভাবে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের বাসভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিই হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন।

পশুপতি সংবাদ প্রকাশের পর চন্দ্রনাথ জনসাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের বিশেষ কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। তিনি খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের পুনর্জাগরণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলার পক্ষে কথা বলতেন।

তাঁর প্রথম প্রধান রচনাগুলোর মধ্যে একটা হলো শকুন্তলা তত্ত্ব। কালিদাসের শকুন্তলার উপর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা ছিল তাতে; সাহিত্যে তন্নিষ্ঠ হিন্দু মূল্যবোধ অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি; হিন্দু

ধর্মের বিপন্নতায় উদ্বিগ্ন বাঙ্গলার সমাজ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল।

জুলিয়েটের সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করে চন্দ্রনাথ অনিয়ন্ত্রিত প্রেম, যা তাঁর মতে অধর্ম, তার উপর আত্মসংযম ও তপস্যাকে শ্রেয় বলে তুলে ধরেন। সেটাই ধর্ম। পরবর্তীকালে ইউরোপে চালু বিবাহ-পূর্ব প্রণয় ইত্যাদি নারী-পুরুষের সম্পর্কগুলোকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন, ভর্ৎসনা করেছেন, জনসমক্ষে নারীর আকর্ষণ ও যৌনতার প্রচারের উপর বিধিনিষেধকে সমর্থন করেছেন পাছে পুরুষরা এর কারণে দুর্বল হয়ে।

অক্সফোর্ড লালিত ও পুষ্ট কট্টর হিন্দু-বিদ্বেষী অমিয় প্রসাদ সেন (জন্ম ১৯৫২) উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্রনাথ তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনটি প্রধান থিম উত্থাপন করেছেন—মহাবিশ্বের মানুষ-কেন্দ্রিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা, নিজেকে পরিমাপ করার জন্য অসামাজিক পরামিতিগুলির ব্যবহারের সমালোচনা করা এবং ঐতিহ্যের সাময়িকতাকে অস্বীকার করা। বোঝা যায় না শ্রীসেন কেন একে ‘চিন্তাহীন ও পক্ষপাতমূলক’ কট্টর হিন্দু ‘অর্থোডক্স’ মতবাদ বলে দাগিয়ে দিলেন। আব্রাহমিক সব ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে যে অযৌক্তিকতা আছে তাকে খণ্ডন করার সাহস তাঁর নেই। এদের সবটাই তো কাঞ্চন মূল্যে কেনা। আবার অতি সাধের প্রাণটুকুও খোয়াবার ভয় আছে!

হিন্দুত্ব

১৮৯২ সালে, চন্দ্রনাথ বসু ‘হিন্দুত্ব—হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস’ নামে আকর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এতে অদ্বৈত বেদান্ত চিন্তাধারা কাজে লাগিয়েছিলেন ও ‘হিন্দুত্ব’ শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই হিন্দুত্ব একটি সাধারণ পরিচয়ের মধ্যে বিচিত্র ঐতিহ্যের বাহক এবং প্রায়শই বিবিধ বিশ্বাস ও অনুশীলনকে মান্যতা দেয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে তিনি কোনো কঠোর পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করেননি কিন্তু তবুও হিন্দুদেরই একমাত্র সেই সত্তা হিসেবে মনে করতেন যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনা অর্জন করেছেন, বুঝতে পেরেছেন যে মানুষ নিজেই ঈশ্বরের এক রূপ এবং এর ধর্মীয় পরিধিকে প্রকাশ করেছে। পরম সম্প্রীতি, উদারতা, সততা ও ঐক্যের একমাত্র আশ্রয়দাতা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ব। তিনি গালভরা ‘ইতিবাচক চিন্তাধারা’কে (পজিটিভিজম, যার প্রবক্তা অগাস্ত কোঁতে। যাতে শুধু কারণ ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, অন্তর্জ্ঞান বা আত্মদর্শন এসবের কোনো জায়গা নেই; কোনো ধর্ম মানতে গেলে পজিটিভিজম মানা যায় না) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেতেন, সেখানে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ মানে স্বয়ং ঈশ্বরের বৈধতা এবং সর্বজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জ। নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিতরা ও নিজস্ব থিসিস থেকে উদ্ভূত তাঁর চিন্তায় চন্দ্রনাথ হিন্দুদের অন্যান্য সকল ধর্মের লোকেদের থেকে উচ্চতর বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক রীতিনীতি ও চর্চা নিয়ে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে আছে এবং তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার চেয়ে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধভাবে শ্রেষ্ঠতর বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি ধর্মান্তরের বিরুদ্ধেও কঠোর ছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ভারত ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মতো বিদেশি মতের প্রচারভূমি হবে না। চন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের একটি মূল অংশ

হিসেবে তন্ত্রকে একীভূত করতেও পিছপা হননি। এটা একটা অন্তর্নিহিত হিন্দু পৌরুষ ও শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করত। তবে বর্ণ ব্যবস্থায় পক্ষে তাঁর মতবাদকে সমর্থন করা যায় না এটা একটা বিচ্যুতি, হিন্দু ধর্মের ব্যবস্থা নয়। আর নারীর স্বাধীনতার নামে যে স্বেচ্ছাচার দেখা যেত বা এখনো যায় তিনি তার বিরুদ্ধে ছিলেন, সামগ্রিক নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়। পুরুষতন্ত্র কোনোদিনই হিন্দু সমাজে ছিল না।

চন্দ্রনাথ গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ হিন্দু পদ্ধতির উপর দুটি সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পপরিচিত ম্যানুয়াল লিখেছিলেন— গার্হস্থ্য পথ ও গার্হস্থ্য বিধি। ধোঁয়া ও আগুনে দীর্ঘ সময় রান্না করার জন্য যে ত্যাগস্বীকার তার মধ্যে হিন্দু মহিলাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটা প্রমাণ পাওয়া যায় বলে তিনি মনে করতেন। ১৯০৪ সালে তিনি পুরুষদের আচরণের জন্য একটি বিস্তারিত ম্যানুয়াল প্রকাশ করেন— সংযম শিখার নিম্নতম সোপান।

১৯০১ সালে তিনি সাবিত্রী তত্ত্ব লিখেছিলেন সাবিত্রী ও সত্যবানের উপর একটি তুলনামূলক গবেষণা। চন্দ্রনাথ শকুন্তলা তত্ত্বের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাবিত্রীকে আদর্শ হিন্দু স্ত্রী হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, বিবাহকে এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরেছিলেন যা মৃত্যু ও অনিত্যতাকে ছাপিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথ 'আদি আর্য' তত্ত্বের সোচ্চার সমর্থক ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে সওয়াল করেন এবং ভারতীয় হিন্দুরা প্রকৃত আর্য বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন।

স্কুল-সিলেবাসে পলাশীর যুদ্ধ নাটকের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সময় নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গেও তিনি বিরোধিতায় জড়িয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে চন্দ্রনাথ জানতে চান কেন একজন হিন্দু একজন বিদেশি মুসলমান শাসকের পরাজয়ে দুঃখিত হবে।

অমিয় সেন উল্লেখ করেছেন যে, চন্দ্রনাথ বসুর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দের ব্যবহার ছিল বিনায়ক দামোদর সাভারকরের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপরীতে শুধুমাত্র একটি ঐতিহ্যগত হিন্দু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রিত করার জন্য। অন্যান্য গবেষকরাও অনুরূপ মত দিয়েছেন। অমিয় সেনের মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ যে সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বের জয়গান করেছিলেন শ্রীবসু, সাভারকরও তাই করতেন। তিনি শুধু আরেকটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রী সাভারকর সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন যে আটশো বছরের পরাধীনতা থেকে হিন্দুর মুক্তির একমাত্র পথ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে এক-ব্যক্তি এক-ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন। এবং তাই সর্বাংশে নির্ভুল পদক্ষেপ হতো। কিন্তু এখানেই মুসলমানরা তাঁদের সাম্প্রদায়িক বা কমিউনাল স্বার্থের পক্ষে বিপদের গন্ধ পেয়েছিল। অর্থাৎ শ্রী সাভারকর শ্রী বসুর হিন্দু ভারতের সাংস্কৃতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির রাজনৈতিক সমাধান দিয়েছিলেন; কোনো বিরোধিতা নেই।

শ্রী বসুর কিছু মত যেমন জাতিভেদ প্রথার সমর্থন, নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরোধিতা, বাল্যবিবাহ সমর্থন, বিধবাবিবাহের বিরোধিতা ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এইখানেই আমাদের থামতে হবে ও ভাবতে হবে। ডিরোজিওর তথাকথিত উদারবাদ ছিল আসলে হিন্দু ধর্মকে হটিয়ে খ্রিস্টান ধর্মকে চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল। মুসলমানরা আগে থেকেই এসে হিন্দুধর্মের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিল তার উপরে খ্রিস্টত্ব ছিল বোঝার উপর শাকের আঁটি। ডিরোজিওপন্থীরদের কাছে আকণ্ঠ মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ ও হিন্দু ধর্মকে সর্বপ্রকারে হেয় করাই ছিল তথাকথিত উদারনৈতিকতা। আসল অ্যাজেন্ডা ছিল হিন্দুধর্মের বিনাশ। হিন্দুধর্মের উপর সহস্রাব্দব্যাপী নিপীড়নের ফলে কিছু বাহ্যিক বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল এবং তার সংশোধনের চেষ্টাও হিন্দু ধর্মের মধ্যেই হয়ে এসেছে। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ কখনোই বাঞ্ছিত নয়। যে দিন ইন্ডিক ধর্ম (মানে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন) শেষ হবে সেদিন পৃথিবীতে সত্যকারের ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান হবে। তাই জবরদস্তি আব্রাহামিক ধর্মসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কঠোর হিন্দুত্ব প্রচার জরুরি হয়ে পড়েছিল।

চন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির হুগলি জেলার কৈকালা গ্রামে ১৮৪৪ সালের ৩১ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ছয় মাস তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। তিনি জয়পুর কলেজ অব অ্যাডুকেশনের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং ভার্নাকুলার টেক্সটবুক কমিটিতে ছিলেন। কয়েক মাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অস্থায়ী ভাইস- চেয়ারম্যানও ছিলেন।

শ্রী বসু ১৯১০ সালের ২০ জুন পরলোকগমন করেন। বঙ্গীয় নবজাগরণের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে তিনি বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। □

With Best Compliments From -

UMESH GANERIWALA

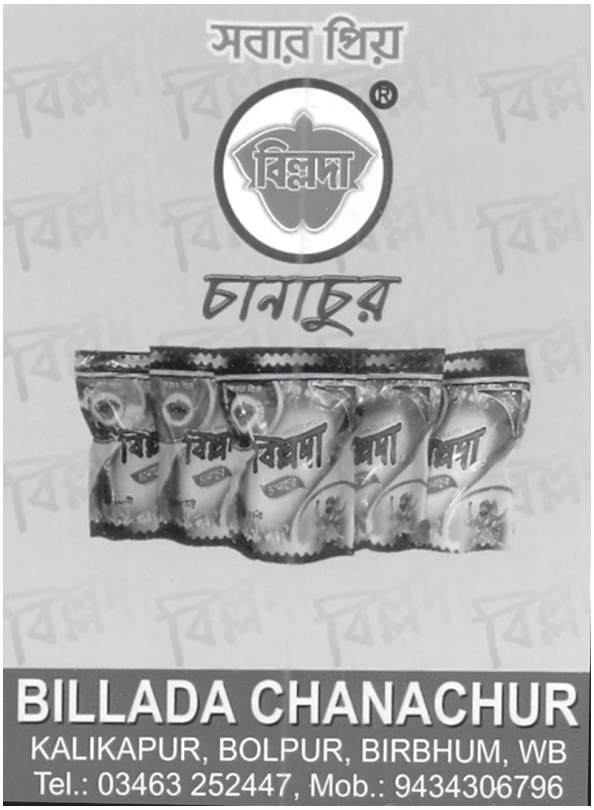

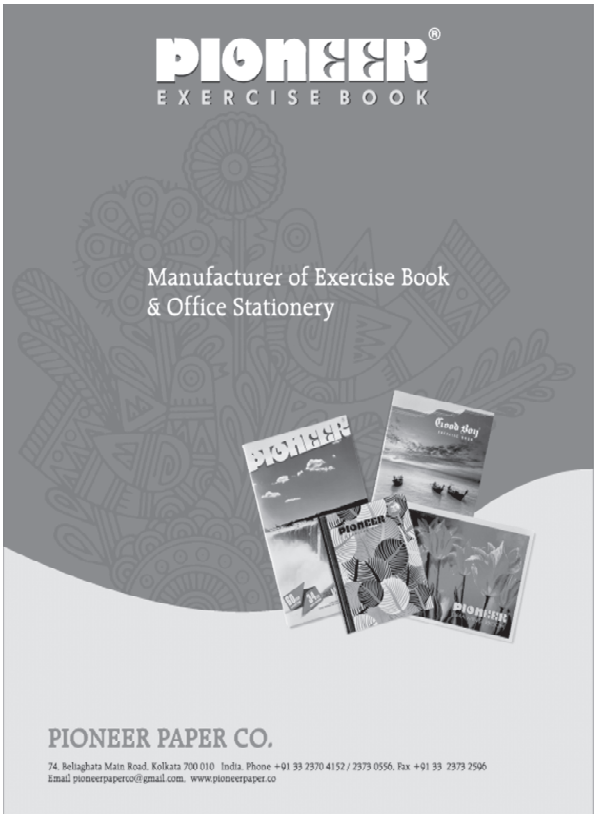

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রাজা শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক

দুর্গাপদ ঘোষ

‘হুজুগে বাঙ্গালি’ কথাটা কে চাউর করেছিলেন জানা নেই। কিন্তু তিনি যে দূরদর্শী ছিলেন তা সাহেবি ‘নিউ ইয়ার ইভ’-এর মজার আদ্যপ্রান্ত হুজুগে মাতাদের দেখলেই ঠাহর করা যায়। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে যাদের সহজে ঘুম ভাঙে না, ১ জানুয়ারি তাদের ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’-এর সম্ভাষণের ঠেলায় কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। নিতান্ত দিন আনা দিন খাওয়া আটপৌরে বাঙ্গালিই নয়, রীতিমতো উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত সমাজ সচেতন এবং ইতিহাস সচেতনদের মধ্যেও ইংরেজি নববর্ষের হেউত দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। কাকভোরে টেলিফোন মোবাইল ফোনে ঘুম ভাঙিয়ে শুরু হয়ে যায় অমুকদা- তমুকদা, অমুকবাবু-তমুকবাবু, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’। দেখা হলেই করমর্দনের ঠেলায় হাতের পাঞ্জা কনকন করতে থাকে। তবে কষ্টটা এর থেকেও কয়েক গুণ বেড়ে যায় যখন একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রচারিত এবং উদারমনস্ক ‘সেকুলার’ মানুষ আলোচনার টেবিলে বক্তৃতার তুফান তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে বাঙ্গালির বঙ্গাব্দ তথা নববর্ষের স্রষ্টা নাকি মুঘল বাদশাহ ‘মহামতি’ আকবর।

পয়লা জানুয়ারি আছে, থাকুক। তার প্রতি উন্নাসিকতার কোনো কারণ নেই। তার সঙ্গে কারো কোনো শত্রুতাও নেই। একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কারণে এখন সারা বিশ্বে কাজকর্মের সম্পর্ক, হিসাব- নিকাশ, দিন-তারিখ নির্ধারণে একটা সর্বগ্রাহ্য সাধারণ বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার হিসাবে পয়লা জানুয়ারিকে বছরের শুরু হিসেবে, কার্যকরী নতুন বছর হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে। যেমন আর্থিক লেন-দেন হিসেবে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বছর ধরা হয়ে থাকে। এই হিসেবে ইংরেজি নতুন বছরের কার্যকারিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সমাজ এবং জাতীয় জীবনে যেখানে যেখানে তাদের নিজস্ব বর্ষপঞ্জী বিদ্যমান সেখানে তাকে পাশে ঠেলে ফেলে পয়লা জানুয়ারিকে নিজেদের সমাজজীবনে নববর্ষে ঠাকুর জ্ঞানে মাথায় তুলে নাচানাচি, হুজুগে মানসিকতাকে যদি ‘বিকৃত’ আখ্যা দেওয়া হয় তবে তাকে ক্ষতিকারক ভাইরাসের কবলে পড়া বলা যায় না কি? মানবদেহে রোগের মতো যে কোনো সমাজদেহে এহেন ভাইরাস যাতে বাসা না বাঁধতে পারে সেজন্য সমাজদেহের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তৈরি হওয়া এবং বজায় থাকা জরুরি। কিন্তু ‘বঙ্গাব্দ’-কে দমিয়ে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ ভাইরাসের প্রকোপ বাঙ্গালি জীবনকে প্রায় আদ্যপ্রান্ত গ্রাস করে ফেলেছে। আর এর মূল কারণটাই হলো ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সেই সঙ্গে ভুল ইতিহাসের চাউর হওয়া। সেই বিভ্রান্তিটা হলো বঙ্গাব্দ নাকি ভারতে বহিরাগত মুঘলদের তৃতীয় বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত ও প্রচলিত।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে পশ্চিমি পণ্ডিতরা ‘তথ্য’ বলে যা কিছু লিখে গেছেন সেটাই এদেশের ইতিহাস। সেখানে মার্শমান, স্টুয়ার্ট, উইলিয়াম জোনস কিংবা ম্যাক্সমুলাররা যা যা বলেছেন বা লিখেছেন সেই সমস্তকে আমরা ইতিহাস বলে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাস’ গ্রন্থের আলোচনা সূত্রে লিখেছেন, ‘সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান তাহারও ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ...কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল... সেদেশের ইতিহাস নাই।’

এই 'দেশ' বলতে সাহিত্য সম্রাট অবিভক্ত বাঙ্গলার কথা বলেছেন। বৃহত্তর ভারত বা ভারতবর্ষের অঙ্গনের প্রাচীন ইতিহাসের যা কিছু বিধৃত রয়েছে কাব্যাশ্রয়ী সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে। বিগত দেড়-দু' হাজার বছরের মধ্য বা আধুনিক যুগের ইতিহাসেও বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। যার মধ্যে বঙ্গাব্দও একটা রত্নের মতো মূল্যবান। তাকে কেবলমাত্র এক টুকরো আঞ্চলিক ঘটনা বলে পাশ কাটানো যায় না। তার চাইতেও বড়ো কথা হলো, এক শ্রেণীর পতিত-বুদ্ধিজীবীদের হাতে তার বিকৃতি ঘটানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছে এবং এখনো তাকে শিরোধার্য করে রাখার চেষ্টা চলছে। যাঁরা বাঙ্গালি জাত্যভিমানে গদগদ হয়ে রাজনীতির আসর মাতিয়ে থাকেন বিশেষ করে তাঁদের জন্য বাঙ্গালির নববর্ষ বঙ্গাব্দের প্রকৃত ইতিহাসের পর্যালোচনা খুবই জরুরি বলে মনে হয়।

দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত এবং শিরোধার্য মতবাদ অনুযায়ী মুঘল বাদশাহ আকবর এই বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন ৯৬৩ হিজরি সনে। এই হিজরির অর্থ হলো ইসলামের প্রবর্তক (পয়গম্বর) হজরত মহম্মদ যেদিন মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রা করেন। ইংরেজি বর্ষপঞ্জী বা খ্রিস্টাব্দের হিসেবে দিনটা ছিল ৬২২-এর ১৬ জুলাই। ৬৩৮-৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা উমর এই হিজরি সন চালু করেন। দিনটাকে পবিত্র মেনে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই দিনে ভারতে মুঘল বাদশাহ আকবরের রাজ্যাভিষেক হয়। কেবল এই তৃতীয় মুঘল সম্রাটই নন, মুঘল বাদশাহরা সকলেই হিজরি সন ধরেই বরাবর বর্ষ গণনা করতেন। সাম্রাজ্য চালাতেন। ইতিহাস গবেষক তথা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক অধ্যক্ষ ড. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, ২৪ বছরের রাজত্বকালের সময়ে আকবর হঠাৎ হিজরিকে বাতিল করে 'তেহরিখ ইলাহি' নামে তাঁর নবসৃষ্ট ইলাহি সনের ঘোষণা করেন। তার আগের ২৪ বছরের রাজত্বটা ছিল হিজরি সনের।

ইসলামি রীতি অনুযায়ী হিজরি সন চলে চান্দ্রমাসের হিসেবে। অন্যদিকে বঙ্গাব্দ গণনা হয়ে থাকে সৌরবর্ষ পদ্ধতিতে। কারো কারো মতে এখন যে বঙ্গাব্দ পালন করা হয়ে থাকে তার প্রেক্ষাপটে নাকি আকবর প্রতিষ্ঠিত 'নওরোজ' উৎসব রয়েছে। এই নিবন্ধ লেখক বেশ কয়েক বছর মুম্বাইয়ে বসবাসকালে প্রতিবেশী একাধিক পারসি পরিবারে 'নওরোজ' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তা পালিত হতে দেখেছেন। তাঁদের কাছ থেকেই জেনেছেন যে নওরোজ শব্দটা হলো 'নব' এবং 'রোজ' অর্থাৎ নতুন দিনের সন্ধিযুক্ত। 'নব' শব্দে অন্তঃস্থ 'ব' থাকার জন্য উচ্চারণ বৈচিত্র্যে শুনতে লাগে 'নওরোজ'-এর মতো। ইসলামিদের কবলে যাওয়ার আগে বর্তমান ইরান ছিল অগ্নির উপাসক পারসিদের দেশ পারস্য। সেখানকার নববর্ষ উৎসব ছিল নওরোজ। বর্ষ গণনা হতো সৌরমাস বা সৌরবর্ষ পদ্ধতিতে। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে সূর্য যেদিন মেষ রাশিতে প্রবেশ করত সেদিন পারস্যদেশে পালিত হতো নওরোজ উৎসব। চলত টানা ১২ দিন ধরে। একে বসন্ত উৎসবও বলা হতো। ইসলামি মতবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুঘল বাদশাহ আকবর এটাকে হিন্দুস্থানে আমদানি করে তাকে শাহি তকমার মোড়কে সাজান। বঙ্গাব্দ আকবর প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদীদের বক্তব্য, 'তখ্‌ত-এ-তাউস'-এ বসে হিজরি সন ধরে সাম্রাজ্য চালাতে গিয়ে আকবর ঠাহর করলেন যে চান্দ্রমাস গণনা পদ্ধতির কারণে যত দিন যাচ্ছে 'হিজরি' হিসেবে দিনক্ষণ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এজন্য তিনি বর্তমান গুজরাট এলাকার তৎকালীন রাজা তথা বাদশাহর বিশ্বস্ত টোডরমলের পরামর্শ চান।

প্রসঙ্গত, চান্দ্র ও সৌরমাস বা বছর ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপে অনুধাবন করা দরকার। পৃথিবী গ্রহের মাঝ বরাবর 'ইক্যুয়েটর' বা নিরক্ষরেখার কল্পনা করা হয়েছে। তার ৯ ডিগ্রি ওপরে এবং ৯ ডিগ্রি নীচে দুটো কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। ওপরের দিকটাকে বলা হয় কর্কটক্রান্তি আর নীচের দিককে বলা হয় মকরক্রান্তি। নিরক্ষ বা ক্রান্তি রেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এই যে দুটো কল্পিত রেখা বা বন্ধনী— এই অংশটাকে বলা হয় রাশিচক্র। এতে মোট ১২টা রাশি রয়েছে। সেগুলোর নাম হলো মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা (মাপদণ্ড), বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন (মাছ)। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থানকে কাল্পনিক রেখায় যুক্ত করলে যে সব কাল্পনিক মূর্তি বা আকার সদৃশ হয় তাদের নামকরণে এই সমস্ত রাশির নামকরণ হয়েছে। এইসব রাশিকে অতিক্রম করতে সূর্যের যে সময় লাগে তাকেই বলা হয় সৌর বছর। এক-একটা রাশিকে অতিক্রম করতে গড়ে এক মাসের মতো সময় লাগে। তবে সমস্ত রাশিকে পুরোপুরি অতিক্রম করতে সময় লাগে ৩৫৬ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট এবং ৪৬ সেকেন্ড। অন্যদিকে চান্দ্রমাস হলো এক পূর্ণিমা থেকে অন্য পূর্ণিমা অথবা এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা। এক্ষেত্রে এক চান্দ্রমাসের সময়কাল হয় সাড়ে ২৯ দিন। এই পদ্ধতিতে এক বছরের মোট দিনক্ষণ দাঁড়ায় ৩৫৪ দিন, ৮ ঘণ্টা, ৩৮ মিনিট, ৩৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ এক চান্দ্র বছরের চাইতে এক সৌরবছর প্রায় ১১ দিন বেশি।

মুঘল বাদশাহ আকবরের রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন টোডরমল। আকবর হিজরি সন ধরে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েন। কারণ এক-এক বছর শেষ এবং শুরুর সময় ঋতুর কিছু পরিবর্তন হয়ে যেতে থাকে। প্রজারা সাধারণত ফসল ঘরে তোলার পর খাজনা দিতেন। আর ফসল ফলে মরসুমে। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিগত বিষয়। ফলে হিজরি সনের সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকছিল না। রাজা টোডরমল কয়েকজন সভাসদের সঙ্গে আলোচনা করে বাদশাহকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, রাজস্ব আদায় তথা রাজকার্য পরিচালনার জন্য সৌরবছর চালু করা হোক আর ইসলামি ধর্মকর্মের জন্য অনুসরণ করা হোক হিজরি সনকে। আকবর যখন বঙ্গদেশকেও তাঁর করতলগত করেন তখন টোডরমলের পরামর্শ মেনে হিজরি সনের বিকল্প হিসেবে চালু করা নতুন পদ্ধতিকে বাঙ্গলার নতুন বছর হিসেবে চালু করেন। এই মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, অতএব বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলেন আকবর। এই সূত্রে, একজন মুসলমান বাদশাহ হয়ে বাঙ্গালির বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন বলে

প্রচার করে সেকুলারি উদারতার ভাবে এই মতের সমর্থকরা এখনো গদগদ হয়ে থাকেন, রীতিমতো গর্ববোধ করেন। কিন্তু তাঁরা এটা খেয়াল রাখেন না যে, আকবর মসনদে বসেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরি সনে। আর এই নতুন বর্ষপঞ্জীর প্রচলন হয় ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় যে ৯৬৩ হিজরি সনে তিনি তাহলে বঙ্গাব্দ চালু করলেন কীভাবে? ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ এবং ৯৬৩ হিজরি সন তো একই বছরে নয়?

এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার আছে। আবুল ফজল, ফিরিস্তা, টোডরমল প্রমুখ যাঁরা আকবরের রাজত্বকালে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিখে গেছেন তাঁদের কেউই কিন্তু বাদশাহর জমানায় 'বঙ্গাব্দ' প্রচলনের মতো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। তাছাড়া আকবর বাঙ্গলার কিছু অংশ দখল করেন ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বা ৯৮৪ হিজরিতে। তার অনেক বছর আগেই রাজস্ব আদায়ের জন্য বঙ্গাব্দের প্রচলন করলেন কীভাবে? এছাড়া তিনি 'তেহরিক ইলাহি' বা স্বর্গীয় বছর নামে যে নতুন অব্দ চালু করেন তার সূচনা হয় প্রথম অব্দ থেকে। তাহলে প্রথমাব্দ থেকে শুরু না করে তিনি ৯৬৩ হিজরি সন থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা করতে গেলেন কেন? এইসব প্রশ্নের এখনো অবধি কোনো সদুত্তর মেলেনি। আরও বড়ো ঘটনা হলো, কিছু কিছু গ্রন্থে তার আগে থেকেই বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরকম উল্লেখযোগ্য দু'খানা গ্রন্থ হলো অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঁকুড়ার মন্দির' এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ইতিহাস পরিচয়'। প্রথম গ্রন্থে ১০২ বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মকাল ৮৯২ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে হলো, ৯৬৩ বঙ্গাব্দের কমপক্ষে ৭১ বছর আগেও অবিভক্ত বাঙ্গলায় বঙ্গাব্দ ছিল।

সৌরমাস হিসেবে গণনার কারণে বঙ্গাব্দেরও অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) হয়ে থাকে। ১৪০০ বঙ্গাব্দ ছিল এরকমই একটা অধিবর্ষ।

হুজুগ বিষয়টা হলো যুগের হাওয়া। আজ উঠেছে, কাল হয়তো আরও বাড়বে কিন্তু পরশু থাকবে না। থাকবে সেটাই যা ঐতিহাসিক সত্য। আর সেই সত্যটা হলো, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বাদশাহ আকবর নন, রাজা শশাঙ্ক।

বঙ্গাব্দের নিয়ম অনুসারে বছর সংখ্যাকে ৭ বিয়োগ করে তাকে ৪১ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ পাওয়া যায় তা যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে সেই বছরটা হবে অধিবর্ষ। এই নিয়ম মেনে প্রতি গণনা বা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে প্রথম বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটার হিসেব পাওয়া যেতে পারে। সেই দিনটা ছিল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। সেই পয়লা বৈশাখ ছিল সোমবার। এ তথ্য জানিয়ে গেছেন বাঙ্গলার একজন মেধাসম্পন্ন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংগঠক সত্যনারায়ণ মজুমদার। তবে আকবর প্রবর্তিত তথাকথিত বঙ্গাব্দের আগেও বঙ্গাব্দ চালু থাকার প্রমাণ মিললেও তা ঠিক কবে থেকে শুরু হয় সে বিষয়ে উল্লেখিত দুই গ্রন্থে কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবত উল্লেখিত দুই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলেই তার উল্লেখ করা হয়নি। প্রবীণ সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক' কি সম্রাট আকবর?' শীর্ষক এক নিবন্ধে জানিয়েছেন '১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের হাত ধরে যখন 'তেহরিক ইলাহি' চালু হয় ঠিক সেই সময় বঙ্গদেশে তার বদলে একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করে নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গাব্দ'। তাঁর মতে, 'হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দের সন ছিল ৯৬৩।' সনটি ৯৬৩ হিজরির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় হিজরি এবং বঙ্গাব্দ একাকার হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার হলেও হয়ে থাকতে পারে।

আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়। তাহলো, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সহ বাঙ্গলার তাবৎ পণ্ডিত এবং বিদ্বৎ সমাজ কিন্তু 'বঙ্গাব্দ' শব্দটা ব্যবহার করতেন না। তাঁরা সব সময় 'বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবত-'শকাব্দ' এবং রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রবর্তিত 'লক্ষ্মণ সংবত' ব্যবহার করে এসেছেন। ভুলেও কখনো তেহরিক ইলাহির ধারে কাছে ঘেঁষেননি। ইলাহি সন ব্যবহৃত হতো কেবল নবাবদের সেরেস্তাখানায়। কিন্তু নব্য বাঙ্গালি সমাজে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী 'কফি হাউস', বৈঠকখানা কিংবা চায়ের আসরে আলোচনায় তুফান তুলে প্রস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন যে, 'বঙ্গাব্দ'-কে কেন্দ্র করে আমরা বর্ষবরণের যে উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকি, বাঙ্গালির সেই নববর্ষ আসলে হিজরি সনের সৌর রূপান্তর এবং এই অব্দের প্রবর্তক হলেন আকবর বাদশাহ। যদিও এখন বঙ্গাব্দ বা বাঙ্গালির নববর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যাপারটা কয়েকটা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আঙিনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'বাঙ্গালি-বাঙ্গালি' বলে আস্ফালনকারীরা মেতেছে ইংরেজি নববর্ষ নিউ ইয়ার ইভ-এর 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর হুজুগে।

মোগল বাদশাহ আকবরের হাতে বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাসের যে কোনো মজবুত ভিত্তি নেই সে বিষয়ে এই নিবন্ধে কয়েকটা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর একটা প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠে আসে, তাহলে এর প্রবর্তন কখন এবং কার দ্বারা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালির এই নববর্ষের উৎস এখনো কিছুটা হলেও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। তবে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য যে তথ্য মেলে তাহলো এর

প্রবর্তন হয় বাঙ্গালি রাজা মহানায়ক শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে। এখানে রাজা শশাঙ্ককে 'মহানায়ক' আখ্যা দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো, তিনিই প্রথম গৌড় রাজ্যকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে বঙ্গদেশ ছিল মুখ্যত গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সে সাম্রাজ্য ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। এক সময়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন মহাসেন গুপ্ত। তাঁর মহাসামন্ত বা সেনাপতি ছিলেন রণকুশলী মহাবীর শশাঙ্ক। নিজের বাহুবলের ওপর তাঁর প্রভূত আস্থা ছিল। ছিল গভীর আত্মবিশ্বাসও। হিন্দু যোদ্ধা হিসেবে রীতিমতো গর্বিত ছিলেন তিনি। গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে তার বেশ খানিকটা অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নতুন রাজত্বের। সে সময় বস্তুত সেটাই গৌড় রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমা বহরমপুরের লাগোয়া খাগড়া এলাকা সংলগ্ন ছিল তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। তৎকালীন দণ্ডভুক্তি বা বর্তমান মেদিনীপুর, উৎকল (বর্তমানে ওড়িশা) এবং কান্যকুব্জ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ) জয় করে গৌড় সাম্রাজ্যের সীমানা সুবিস্তৃত করেন শশাঙ্ক। প্রায় একই সঙ্গে বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত মগধ রাজ্য জয় করে বঙ্গরাজ্যের সীমানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। লিপিভাষা, ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ অবলম্বন করে তাঁর গৌড় রাজ্যকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ দেন। অনেকের ধারণা, 'গৌড়' ক্ষেত্র ছিল কেবলমাত্র বর্তমান মালদহ জেলার একাংশ। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমলে মহারাষ্ট্রে মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যেমন স্বাধীন হিন্দুপদ পাদশাহী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে প্রায় একই রকম হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা শশাঙ্ক। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভাকর বর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করে তরুণ রাজা শশাঙ্ক আসীন শৌর্যের পরিচয় রাখেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ওই বছর অর্থাৎ ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২-১৩ বছর আগেই শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সন-তারিখের হিসেবে সেটা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ হওয়াটাই সমীচীন। ওই বছরের ১ বৈশাখ বা অন্য কোনো দিন থেকে তিনি যদি কোনো নতুন অব্দের প্রচলন করে থাকেন তবে আজকের বঙ্গাব্দের সঙ্গে কালের হিসেবে তা হুবহু মিলে যায়। এ থেকে প্রস্থাপিত হয় যে বাঙ্গালির বর্ষাব্দ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয়েছে রাজা শশাঙ্কের হাত ধরেই, তৃতীয় মোঘল বাদশাহর হাত ধরে নয়।

বলা বাহুল্য, প্রয়াত সত্যনারায়ণ মজুমদারের হিসেবে সমৃদ্ধ পূর্বোল্লেখিত তথ্যও এর সঙ্গে মিলে যায়। ১৪০০ বঙ্গাব্দকে অধিবর্ষ ধরে প্রথম পয়লা বৈশাখের যে দিনটা পাওয়া যায় সেটা হলো ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল, সোমবার। তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতি- প্রকৃতির সামান্য হেরফেরে বর্তমানে তা ১৪ বা ১৫ এপ্রিলে হতে দেখা যাচ্ছে।

রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ উপাসক অর্থাৎ শৈব মতাবলম্বী একজন বরেণ্য বাঙ্গালি রাজা। শৈবদের কাছে সোমবারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। বঙ্গাব্দের সূচনা বৈশাখ মাসে যা কিনা গুপ্তযুগের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক রাজা শশাঙ্ক, একথা বলা গৌরবেরও বিষয়। কারণ প্রথমত, তিনি নিজে ছিলেন বঙ্গেরই একজন। সেই সঙ্গে ভারত গৌরব গুপ্তবংশের আদর্শ-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দ্বিতীয়ত, ভারতে বিদেশি আক্রমণকারী মোঘল বংশের তৃতীয় বাদশাহর হাত ধরে বাঙ্গলার বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন হয়েছে এটা প্রস্থাপন করার পেছনে যেমন সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই তেমনি নেই কোনো গৌরবের আলোকশিখাও। কিন্তু 'হুজুগে বাজারি'র 'নিউ ইয়ার ইভ'-এর ঠেলায় এখন বাঙ্গালির সেই গর্বের বঙ্গাব্দ হেথা হোথা দু'চারটে 'বর্ষবরণ'-এর আনুষ্ঠানিকতা এবং 'এসো হে বৈশাখ' কিংবা 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার...' জাতীয় রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে এসে ঠেকেছে। পাশাপাশি নিউ ইয়ার ইভ-কে কেন্দ্র করে 'পার্টি' এবং পার্টির নামে হুল্লোড়ের যে মাত্রায় আত্মীয়করণ ঘটছে তাতে এমনটা মনে করার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়েছে যে এদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের ১৯০ বছরের দাসত্বকে আমরা বোধহয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মেনে নিয়েছি।

আসলে কৌশলী প্রচারের দাপটে পালটে যাচ্ছে আমাদের মানসিকতা। স্বকীয়তা, নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাসকে অস্বীকার করার মধ্যে যে হীনমন্যতা ও ভণ্ডামি কাজ করে, পরাধীনতার যুপকাষ্ঠে দাসত্বের শৃঙ্খল যে হীনমন্যতার জন্ম দেয়, পঙ্গু করে দেয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচিয়ে, বুক চিতিয়ে চলার ভিতকে, সেটাই এখন আমাদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মসম্মানকে কুক্ষীগত করে ফেলেছে। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কিংবা সুভাষচন্দ্রের মতো বাঙ্গালি মনীষীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি, আপন কৃষ্টিকে অবলম্বন করে থাকাটা সেকেলে নয়। বরং অতীত ইতিহাসের চরণচিহ্ন ধরেই ভবিষ্যতের জয়যাত্রা হলো বাঙ্গালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণসত্তা। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু প্রবীণ সবকিছুই অনৈতিহাসিক ও বাতিলযোগ্য— এই জাতীয় উন্নাসিকতা ও ভণ্ডামিকেই মনে হয় ইংরেজিতে আইকনোপ্ল্যাজম বলা হয়ে থাকে। এটা কিন্তু সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটানোর ভাইরাসের মতো। এতে নিজস্ব গৌরবময় সভ্যতা, সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের ঐতিহ্যকে বিশ্বের চোখে অকিঞ্চিৎকর, হেলাফেলার বিষয় করে ফেলা হয়। তাই মনে হয় একেবারে তলিয়ে যাবার আগে নিজেদের অভ্যাসগত অন্তর্ঘাতে একটু ভাটার টান ধরলে বোধহয় ভালো বই মন্দ হবে না। 'বঙ্গাব্দ' আকবর প্রবর্তিত— এই ঐতিহাসিক তথ্যকে যদি প্রগাঢ় করার প্রচেষ্টা থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কৈফিয়তের দায়ভারটা হয়তো কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে। তাতে উদারমনস্ক বাঙ্গালির আত্মমর্যাদা বাড়বে বই কমবে না। আর হুজুগ বিষয়টা হলো যুগের হাওয়া। আজ উঠেছে, কাল হয়তো আরও বাড়বে কিন্তু পরশু থাকবে না। থাকবে সেটাই যা ঐতিহাসিক সত্য। আর সেই সত্যটা হলো, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বাদশাহ আকবর নন, রাজা শশাঙ্ক। □

অনন্ত সাগরের বুকে কত যে তরঙ্গ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

বিদ্যাসাগর কি বাংলা গদ্যের জনক? অথবা তাঁর পূর্বসূরি রাজা রামমোহন? কোনো কোনো মহল এমন একটা ভাষ্য খাড়া করবার চেষ্টা করলেও তথ্যপ্রমাণ সে ভাষ্যকে সমর্থন করেনি। বরং উলটোটাই প্রমাণ হয়েছে যে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বহু আগে থেকেই নানা রূপে নানা ধারায় বাংলা গদ্য লেখার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। হতে পারে সেই গদ্য ছাপাখানার হাত ধরে বইয়ের চেহারা নেয়নি, নেহাৎ কাজ চালানোর 'কেজো' বাংলা হিসেবে সমাজে থেকে গেছে। কিন্তু তা বলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব মোটেই খাটো হয়ে যায় না। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় কাব্য বা সাহিত্য হিসাবে যা লেখা হতো, তাদের মাধ্যম ছিল ছন্দ। হয় কবিতা নয় গান। প্রায় সব কাব্যই পাঁচালির ঢঙে খানিকটা গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার মতো আবৃত্তি করা হতো। গ্রামবাঙ্গলার শ্রোতারা ছন্দোবদ্ধ পাঁচালির ঢঙে মজে গিয়ে কথকঠাকুরের চারপাশে উপভোগ করতেন ঠাকুর-দেবতার মর্ত্যলীলার সেইসব আখ্যান। প্রধানত পয়ার আর ত্রিপদী ছন্দে লেখা এইসব কাব্য ছন্দের স্থিতিস্থাপকতার গুণে কিছুটা গদ্যের মতোই লাগত। ফলে সেকালের বাঙ্গালিরা গদ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত হলেও লিখিত গদ্য চালু হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত লিখিত গদ্য যখন চালু হলো, তারপরেও বহুদিন ধরে তা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সালিশি অথবা সহজিয়া বৈষ্ণবদের পুঁথিপত্রের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, সাহিত্যের ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

এরপর এলেন রামমোহন। শুরু হলো বাংলা গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার। যদিও সে গদ্যের কাঠামো আর বিন্যাসে সাহিত্য সৃষ্টি করার মতো অমিত শক্তি ছিল না— তবে তা নিঃসন্দেহে গদ্যই বটে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'এ গদ্য আমরা যাহাকে মডার্ন প্রোজ বলি তাহা নহে, পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।' হয়তো ঠিকই বলেছেন প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু মনে রাখতে হবে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল বিতর্কের মঞ্চে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে নিজের বক্তব্য

> রেনেসাঁ-পুরুষের একটা বড়ো লক্ষণ হলো, কোনো কিছুতেই তাঁদের দমানো যায় না। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যা তিনি করবেন বলে মনস্থ করেছেন, সে কাজ করবেনই।

প্রমাণ করা। সেই ভাষা কতখানি আধুনিক হয়ে উঠল, শিল্পরূপ ধারণ করার যোগ্য হতে পারল কি না এসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, ঘামানোর কথাও নয়। তবে বলে না যে খাঁটি সোনা সোনাই থাকে, হাজার আড়ালে রাখলেও চিনিয়ে দিয়ে যায় নিজের জাত। সেকালের খটমট বাংলা গদ্যের জমানায় বেশ কয়েকবার এমন সুন্দর সরল গদ্য লিখেছিলেন রামমোহন যে অবাক হয়ে যেতে হয়। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একটি নমুনা তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে— 'বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; .... স্ত্রীলোক সকাল বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করেন — দুঃখ এই যে ... তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া

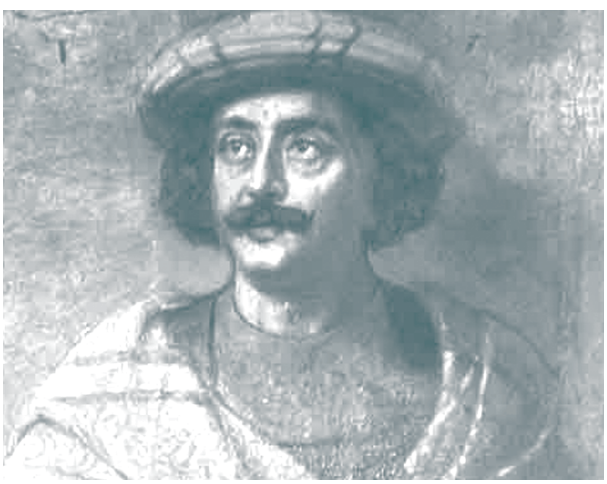

আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।'

রামমোহনের সময়কালে এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগেই সাধু ছাঁদের বাংলা গদ্য, শিক্ষিত সমাজে যা সাধুভাষা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে তা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পিছনে সেকালের সাময়িক পত্রের অবদান কম ছিল না। এর পরেই এলেন বিদ্যাসাগর। ছেপে বেরুল তাঁর প্রথম মুদ্রিত অনুবাদ গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। গদ্যভাষা যে নেহাৎ কাজের ভাষা নয়, ইচ্ছে করলে তার শরীরেও রূপলাবণ্য সঞ্চার করা যায়, ভাষার টানে মজে যায় পাঠক, তা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। সমসাময়িক অনেকে বলতেন, বিদ্যাসাগর এমন আর কী করেছেন। শুধু দু'চারটে অনুবাদ করেছেন। তাকে তো আর মৌলিক রচনা বলা যাবে না! না হোক মৌলিক রচনা, ভুলে গেলে চলবে না যে সে সময়টা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গঠনকাল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বার বার দেখা গেছে, একটা ভাষা, তার সাহিত্য গড়ে ওঠার সময়ে অন্য ভাষা থেকে অনুবাদের বিরাট বড়ো ভূমিকা থাকে; বাংলা ভাষা আর সাহিত্য গড়ে ওঠার সময়েও ঠিক সেই জিনিসটা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে যাকে সাহিত্যের সাধুভাষা বলা হয়, বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতিতে সেই ভাষা কেমন হওয়া উচিত তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।

কেমন সে ভাষা? একবার দেখে নেওয়া যাক : 'চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে, তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুনগুন রবে গান করিতেছে;... সর্বত্র শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া, তথায় উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।'

অর্থাৎ, একটা কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক যদি না-ও হন, তাঁদের হাতে এক বিশেষ সময়ে একটা ভাষার ভাঙচুর আর নবনির্মাণ যেভাবে হয়েছে, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনোভাবেই খাটো করা সম্ভব নয়। আর বিদ্যাসাগর? সংস্কৃত সাহিত্যের অসামান্য কাব্যগুণ আর অনুপম দৃশ্যমানতা কীভাবে সদ্য গড়ে ওঠা বাংলায় সরাসরি নিয়ে আসা যায় তা বুঝে নিতে তাঁর সাধনার কোনো খামতি ছিল না। আসলে সময়টা ছিল বাঙালির সমাজ-সাহিত্য আর সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ। বলার অপেক্ষা রাখে না, রামমোহন আর বিদ্যাসাগর সেই নবজাগরণের অগ্রদূত।

কোনো বিধবা যদি ইচ্ছা করে সে আবার বিয়ে করতে পারে। আর যদি এই বিয়ে হয়, নতুন আইন মোতাবেক ওই নারীর গর্ভস্থ সন্তান জারজ বলে বিবেচিত হবে না। ব্যাস, এটুকুই। বাঙ্গালি সমাজের এই যুগযুগান্তের রীতিনীতি নিয়ে আর কোনো জটিলতায় যেতে চায়নি সেকালের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট।

তবে মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর বা রামমোহন সমাজ সংস্কার কিংবা ভাষা সংস্কারের জন্য যা কিছু করেছিলেন, নিজেদের বিবেকের তাগিদেই করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের রেনেসাঁ ম্যান বা নবজাগরণের দূত বলে যে সর্বাত্মক প্রচার শুরু হয়, তার সঙ্গে তাঁদের কোনোরকম যোগ ছিল মনে করার কারণ নেই। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কারমুক্ত মন, মানুষের কল্যাণে কিছু করার অভিপ্রায়— সবই এসেছিল ভিতর থেকে। সেই অভিপ্রায়ের এতটাই শক্তি যে হাজারো বিরোধিতা আর কুৎসা সত্ত্বেও তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর চরিত' রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন ঃ ' মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙ্গালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।' এর পর রবীন্দ্রনাথের উপসংহার ঃ 'বিদ্যাসাগর ও রামমোহন বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙ্গালি হওয়া সত্ত্বেও বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় য়ুরোপীয় মহাজনদের তুলনীয় ছিলেন।'

প্রশ্ন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এমন বিরল প্রশস্তির পরও উঠবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সত্যি কি তেমন দরকার ছিল বিদ্যাসাগরের? রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ ' এই ব্রাহ্মণ তনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি দিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলেও অনায়াসে তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন। — অথচ তেমন মসৃণ পথে তিনি হাঁটলেনই না। হাঁটলেন শেষে তিনি কোন রাস্তায়? যে রাস্তা দুর্গম, বিপজ্জনক। যে রাস্তায় হাঁটলে সহজে আর কোনো সহযাত্রীর দেখা পাওয়া কঠিন। নিন্দুক আর সমালোচকের ভিড় পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে। ইতিহাসের মনোযোগী পাঠকমাত্রেই জানেন, সতীদাহ প্রথা এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে, রামমোহন যখন এই প্রথা বিলোপ করতে সমস্ত শক্তি নিয়ে আসরে নামেন, তখন কিছুদিন একনাগাড়ে হইচই চললেও নিজেদের অস্বস্তি ঢাকতে পারেনি রক্ষণশীল সমাজ। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা একদম চুপ করে যান। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে ব্যাপারটা ঘটল উলটো। শান্ত পুকুরে এসে পড়ল মস্ত একখান ইট, সমাজ জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ, আর ঘূর্ণি। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন

ঃ ‘ সমগ্র বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিধবা বিবাহের সংবাদ দিতে পারে এমন লোক, এমন সংবাদপত্র, এমন পুস্তক বা পুস্তিকা লোকের বহু আগ্রহের জিনিস হইয়া উঠিল।.... শান্তিপুরের তাঁতিরা বহুমূল্যে বস্ত্রের উপর বিধবা বিবাহের গান তুলিতে আরম্ভ করিল। ... বিধবাবিবাহ বিষয়ক গানগুলি পল্লীগ্রামে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে পর্যন্ত গাহিতে শুনিয়াছি।’

সেই তুলকালাম আন্দোলনের সময়ে শান্তিপুরের বিদ্যাসাগরপেড়ে গানটি তো একেবারে মাস্টারপিস! শান্তিপুরের তাঁতিরা আদর করে গান বেঁধেছিলেন ঃ

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।।
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।

এ তো গেল সাতে-পাঁচে না থাকা সেকালের আমজনতার মনের কথা। মাঝপুকুরে থান ইট পড়লে সোজা ঢেউ যেমন ওঠে, উলটো ঢেউয়ের সংখ্যাও যে কম নয়। রক্ষণশীল সমাজের লোকজনও গুনতিতে কম ছিলেন না। তাঁরা রে রে করে নেমে পড়লেন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন ঃ

কোলে কাঁখে ছেলে ঝোলে, এসকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁখা শাড়ি।।
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর।।

রেনেসাঁ-পুরুষের একটা বড়ো লক্ষণ হলো, কোনো কিছুতেই তাঁদের দমানো যায় না। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যা তিনি করবেন বলে মনস্থ করেছেন, সে কাজ করবেনই। সমাজ জুড়ে এই তুমুল আলোড়নের মধ্যে একবার নাকি এক ধনী জমিদার ‘অনাচারী’ বিদ্যাসাগরকে খতম করতে গিয়ে ‘সুপারি কিলার’ লাগিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর কোনো সূত্রে খবরটা জেনে যান। তারপর একদিন সরাসরি জমিদারের বৈঠকখানায় হাজির। বললেন, ‘মশাই, শুনলুম আমাকে মারার

> রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ ‘ এই ব্রাহ্মণ তনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি দিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলেও অনায়াসে তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন। — অথচ তেমন মসৃণ পথে তিনি হাঁটলেনই না। হাঁটলেন শেষে তিনি কোন রাস্তায়? যে রাস্তা দুর্গম, বিপজ্জনক। যে রাস্তায় হাঁটলে সহজে আর কোনো সহযাত্রীর দেখা পাওয়া কঠিন।

জন্য আপনার লোকজন চারপাশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি ওদের অত কষ্ট দেওয়ার দরকার কী? আমি নিজেই এসে পড়েছি। কাজটা তাহলে সেরে ফেলুন।’ জমিদার মশাইয়ের তখন ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা!

বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে বিদ্যাসাগর যখন আসরে নামেন, তখন তাঁর বয়স ছিল অনেক কম। বাঙ্গালি সমাজে বাল বিধবাদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে তাঁর বাবা-মাও ছেলেকে বলেছিলেন, যদি শাস্ত্রবিচার করে প্রমাণ পাও বিধবাদের নতুন করে বিয়ে দিতে কোনো বাধা নেই, তবে তুমি অবশ্যই একাজে এগোবে। এই অনুমোদন শিরোধার্য করে কাজে নেমে পড়লেন বিদ্যাসাগর। দেখলেন, ব্যাকরণ-কাব্য-অলংকার-দর্শন এইসব শাস্ত্র দিয়ে হবে না। বরং যে শাস্ত্রের বিধান সকলে মেনে নেবে, দরকার তেমনই ধর্মশাস্ত্র। কী সেই ধর্মশাস্ত্র? ভগবান বেদব্যাসকে সাক্ষী রেখে বিদ্যাসাগর বলেছেন, ‘বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে স্মৃতি আর পুরাণ সরিয়ে রেখে বেদ অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি হয় স্মৃতি আর পুরাণ— সেক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে স্মৃতির বক্তব্য। বিদ্যাসাগর দেখলেন, এক্ষেত্রে মহর্ষি বশিষ্ঠর পরাশর সংহিতা যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র, তাই বিধবা বিবাহ নিয়ে সেখানে যে বিধি রয়েছে, মান্যতা পাওয়া উচিত তারই। পরাশর সংহিতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে, কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত কর্তব্য কর্ম। তাই শিষ্টাচার বিরোধী তকমা দিয়ে কোনোমতেই তাকে বাতিল করা যায় না।

একগুঁয়ে বিদ্যাসাগর নিশ্চিত হয়ে এবার যে যুক্তি দিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা শিবেরও অসাধ্য। ব্রিটিশ রাজপুরুষরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝতেন। বুঝতেন বলেই অগত্যা তাতে সিলমোহর লাগাতে আইন প্রণয়ন করলেন। তাছাড়া তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, বিধবা বিবাহ নিয়ে আইন করলেও তাতে কোনো জবরদস্তির ব্যাপার থাকছে না। কোনো বিধবা যদি ইচ্ছা করে সে আবার বিয়ে করতে পারে। আর যদি এই বিয়ে হয়, নতুন আইন মোতাবেক ওই নারীর গর্ভস্থ সন্তান জারজ বলে বিবেচিত হবে না। ব্যাস, এটুকুই। বাঙ্গালি সমাজের এই যুগযুগান্তের রীতিনীতি নিয়ে আর কোনো জটিলতায় যেতে চায়নি সেকালের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। বিদ্যাসাগরও নতুন করে জোরাজুরি করেননি।

পরবর্তীকালে বহুবিবাহ আন্দোলন নিয়ে বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় নেমে তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ ‘দেশটা তো শাস্ত্রে চলে না। চলে লোকাচারে।’ খুব ভুল বলেননি বঙ্কিমচন্দ্র। বিধবা বিবাহ হলো বটে, উদ্যোক্তা বিদ্যাসাগরের পকেট থেকে অনেক টাকাও গেল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবকিছু কেমন মিইয়ে গেল। চিৎকার-হুল্লোড় যেভাবে উঠেছিল, তা অবশিষ্ট রইল খুব সামান্যই। সতীদাহ প্রথা রদের মতো স্থায়ী আর সর্বাত্মক চেহারা নিল না।

কী বলা যায় একে? বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া? হবেও-বা। কিন্তু যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব বা মর্যাদা তাতে এতটুকুও ম্লান হয়ে যায় না। □

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

With Best Compliments From -

A

WELL WISHER

(A.B.)

নোংরা মানুষদের অনাবশ্যক তোল্লাই নয়

২১ মার্চ ২০২২ সংখ্যায় 'রাজ্যপাট' কলমে ২ বছর দূরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনে মোদীর বিকল্প কে হবেন তাই নিয়ে প্রতিবেদক একটি ন্যারেটিভ যাকে বলে কী হলে কী হবে, যেমন মাসির গোঁফ থাকলে মামারা পাঁচ ভাই হতে পারতেন গোছের আলোচনা করেছেন। চার চারটি রাজ্যে শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় জয় করে মোদী তাঁর নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি সফলভাবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রমাণ আবার রেখেছেন। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের আগে লাগাতার কলমবাজি হয়েছে যার অনেকটাই কাল্পনিক যে এখানে হারলে মোদীর ভাবমূর্তি চুরমার হয়ে যাবে। তখন দিল্লি দূরঅস্ত। এখন দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হওয়ার পর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে নিবেদন করা যায় যে ২০২৪-এর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিষয়টা আজ জাতির জন্য নিয়তি নির্দিষ্ট।

ইতিমধ্যে দ্য 'কাশ্মীর ফাইলস' নামে একটি চলচ্চিত্রে কাশ্মীরি হিন্দুদের ওপর ৯০ সালে সংঘটিত নৃশংস অপরাধের উন্মোচন হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে মোদীজী কখনও পিছপা নন। তিনি পরিচালককে বাহবা দিয়েছেন। বারংবার সন্ত্রাসবাদীরা বিবেক অগ্নিহোত্রীকে খুন করার হুমকি দেওয়ায় সরকার তাঁকে ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দিয়েছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে মানুষ ছবির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছে। বম্বের মেন লাইন সিনেমার বড়ো রিলিজ বেচারা অক্ষয় কুমারের 'বচ্চন পাণ্ডে' বা 'রাধেশ্যাম মাছি' তাড়িয়েছে। এই 'কাশ্মীর ফাইলসকে' প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলে প্রকাশ্য দিল্লির বিধানসভায় প্রবল বিদ্রূপ করেছেন কেজরিওয়াল ও তাঁর শাকরেদরা। তিনি লক্ষাধিকবার ট্রোলড হয়েছেন। তার অতীত ভয়ংকর কলঙ্কিত। তিনি দেশহিতৈষী কোনো সংজ্ঞাতেই নন। উলটে তিনি অবশ্যই একজন দেশবিরোধী শক্তি। তিনি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়েছিলেন। পুলওয়ামায় সামরিক ট্রাকে বিস্ফোরণের দায় মোদীর ওপর চাপিয়ে ঘৃণ্য বক্তব্য রেখে বলেছিলেন, 'ভোট জুটানে কি লিয়ে আউর কিতনে মারোগে মোদীজী'। তিনি যে আন্দোলন থেকে উঠেছিলেন সেই আন্না হাজারেকে পদাঘাত করে এসেছেন। তবে সাম্প্রতিক কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে মুসলমান ভোট পেতে তিনি নিরপরাধ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যন্ত্রণাকেও যে রেয়াত করলেন না তা দেশবাসী ক্ষমা করবে না। এর আগেও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কাউন্সিলার তাহির হোসেনের বাড়ির ছাত থেকে হিন্দুদের ওপর বোমাবাজি করিয়েছিলেন, তার মামলা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বস্তিকাই একমাত্র হিন্দুদের কথা বলা সত্যনিষ্ঠ একটি সাপ্তাহিক। আশা করব এই ধরনের নোংরা মানুষদের অনাবশ্যক তোল্লাই দিয়ে পত্রিকার পাতার অপচয় বন্ধ করার দিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন। কেনন এখানে কে জিতবে কে হারবে তা গৌণ, কে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কে দেশবিরোধী— সেটাই বিচার্য। অনাবশ্যক অন্য মুসলমান তোষণের প্রসঙ্গে যাওয়াও রুচিকর নয়।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

রামপুরহাট গণহত্যা গণতন্ত্রের লজ্জা

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বীরভূমের রামপুর হাটের বগটুই গ্রামের গণহত্যা গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সভ্য সমাজের মানুষ হয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে মানুষগুলিকে ঘরের ভিতর তালা বন্ধ করে পেট্রোল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করলো। এই রাজ্যে আগেও গণহত্যা হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গলার শান্তি ও সম্প্রতি রক্ষার দায়িত্ব যার উপর তিনি আইনের শাসনের বদলে শাসকের আইন প্রতিষ্ঠিত করছেন। তাই পুলিশ প্রশাসন শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের কথায় চলছে। শাসক দলের একজন উপপ্রধান মার্ডার হওয়ার আগে নিরাপত্তা চেয়ে পায়নি, শেষে অপর গোষ্ঠীর হাতে খুন হতে হলো। এই খুন হওয়ার পরেও পুলিশ ওই এলাকায় টহলদারি করেননি। ফলে ভাদু শেখের খুনের বদলা নিতে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। এরপর সকাল থেকেই শাসকদলের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চাপানোতর চলে। কেউ বলেন শর্ট সার্কিট থেকে টিভি ফেটে হয়েছে কেউ বলছেন শাসকদলের বদনাম করতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আসল সত্য স্বীকার করার সাহস এদের নেই। একের পর এক সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আসলে গত বিধানসভায় বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য যাদের মনে সাম্প্রদায়িক ভীতি তৈরি করে ৯৫ শতাংশ ভোট এককাট্টা নিজেদের বাক্সে নিয়ে বিপুল জনাদেশে বাঙ্গলার মসনদে বসেছেন, সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে রাতের অন্ধকারে নারকীয় ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে জেলায় ঘটনা ঘটেছে সেই জেলার সভাপতির বাজার গরম করা কথাবার্তাগুলি এইসব ঘটনা ঘটার জন্য উৎসাহিত করেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২৬ জন খুন হয়েছে। তা সত্ত্বেও শাসক দল চিৎকার করে বলছে অন্য রাজ্যে এর থেকেও বেশি খুন হয়। অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। আসলে পুলিশ প্রশাসন আর পার্টি সব একসঙ্গে মিশে গেছে। শাস্তি আর হেনস্থার ভয়ে পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষ শান্তি, শৃঙ্খলা আর ভাতা, ভিক্ষার জন্য তৃতীয়বারের জন্য এই সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভোট পরবর্তীতে লাগাম ছাড়া হিংসা বিরোধীদের রাজনৈতিক ময়দান ছাড়া করেছে। এখন শুধু একদলের গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাটমানির ভাগাভাগির বিরোধ চলছে। তাই শাসকদলের লোক শাসকদের লোককে এইরকম পুড়িয়ে মারছেন। এটা গণতন্ত্রের চরম লজ্জা।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ফঃ ৩

With Best Wishes :-

Radha Electricals

Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে বাঙ্গালির রেনেসাঁ

ডঃ রাজলক্ষ্মী বসু

লজ্জার আভাও আগুন হতে পারে। যতই বিতর্ক থাকুক না কেন তবুও বলতে হবে পোশাক হচ্ছে আধুনিকতার বার্তা। স্টাইল বলে দেবে আমি কেমন। আমরা কতটা রুচিশীল, মার্জিত, আধুনিক। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বলে তাদের রেনেসাঁ তখনই স্বীকৃতি পায় যখন তার প্রভাব পোশাকে পড়ে।

মৃণালিনী দেবী

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন এ দেশের প্রথম ফ্যাশন ডিজাইনার কে? কার ফ্যাশন সেন্সে বাঙ্গালি মেয়েরা বাড়ির বাইরে আসার মনোবল পেল? দ্বিধাহীনভাবে উত্তর হবে জ্ঞানদানন্দিনী। অন্তঃপুরে থেকে রাজপথের আলো দেখতে হলে মেয়েদেরও জুতো, চটি দরকার। দরকার অন্তর্বাস। এমনভাবে শাড়ি পরুক মেয়েরা তা যেন তাদের ব্যক্তিত্বে পূর্ণ শশীর উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দেয়।

ঠাকুরবাড়ির মেজছেলে অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। সত্যেন্দ্রনাথ যতবার এদেশের মেয়েদের পর্দার আড়াল থেকে বের করে সমানাধিকারের পদক্ষেপ নিয়েছেন, ততবারই তাঁর যোগ্য সহকারী হয়েছেন তাঁরই সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী। বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যখন চিঠিতে লিখছেন, ''আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাহার অনেক নির্ভর।'' মনের মিলনই বোধ হয় প্রকৃত বিবাহ। জ্ঞানদাকে কন্যাদান করা হলেও তাঁর ভাবনার পরিসর পরবর্তীতে প্রমাণ করেছিল যে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে প্রকৃতই বিবাহ করেছেন। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পর্দা ছেড়ে অনাত্মীয় পুরুষের সামনে আসেন। সব মেয়ে যেন সেই পথ অনুসরণ করতে পারে তাই জ্ঞান- বুদ্ধি- শিক্ষা- বিপ্লবের সঙ্গে তিনিই পোশাক বিপ্লবের ফিতে কাটলেন। স্বামীর সঙ্গে যখন গুজরাট যান তখন আবিষ্কার করলেন এক নতুন শাড়ি পরার ধরন। চললো পরীক্ষানিরীক্ষা। নাম ছিল ব্রাম্বিকা শাড়ি। ব্রাহ্ম মহিলারা তা প্রথম গ্রহণ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী সেই শাড়ির বিজ্ঞাপন দেন কাগজে। পরবর্তীতে তা ঠাকুরবাড়ির শাড়ি হিসেবেই পরিচিত হয়। আজ আমরা যেভাবে শাড়ি পরছি তার ফ্যাশন ডিজাইনার জ্ঞানদানন্দিনী।

স্বর্ণকুমারী দেবী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্ঞানদানন্দিনীর গভীর প্রভাব ছিল। বিলেত যাওয়ার আগে পাশ্চাত্য রীতি শিখতে রবি ঠাকুরকে মেজবৌঠানেরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। যখন বাঙ্গলার গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষর তখন নারী স্বাধীনতার মশালে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করলেন জ্ঞানদা। তিনিই বেঙ্গল স্কুল চিত্রকলা আন্দোলন শুরু করেন। ঠাকুরবাড়ির ছোটোরা ছবি আঁকতো জ্ঞানদার বসানো লিথোপ্রেসে। পারিবারিক পত্রিকা 'বালক' মেজবৌঠানেরই সৃষ্টি। রবি ঠাকুরের লেখার হাতেখড়ি ওখানেই। জ্ঞানদানন্দিনীর কলমে সাতভাই চম্পা এবং টাক ডুমাডুম অনন্য সৃষ্টি। পরবর্তী ভারতী পত্রিকায় তাঁর রচিত কিন্ডার গার্টেন এবং স্ত্রী শিক্ষা নারী মুক্তির উল্লেখযোগ্য রসদ। মহিলারাও যে সৃষ্টি করতে পারেন এবং তা যে পুরুষেরও সমান্তরাল এ তো জ্ঞানদানন্দিনীই প্রমাণ করলেন। মরাঠি রচনার বঙ্গানুবাদ থেকে স্বদেশ ভাবনার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিন্দা ও স্বদেশানুরাগ সে সময় বৈশিষ্টপূর্ণ মননের পরিচয় দিয়েছিল। ওই যে সবাই বলে না, মেয়েদের অবার শখ কী? না, মেয়েদেরও শখ হয়। আজকে যত ঠাকুরবাড়ির গবেষক আছেন, তাঁরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ফোটো দেখতে পাচ্ছেন জ্ঞানদার সৌজন্যেই।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের শাড়ি পরার রীতি।

নাটকে অভিনয়ের জন্যও জ্ঞানদার ডাক পড়ত। রাজা ও রাণী নাটকে সুমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় সে যুগে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

তিনি যে সাহসিকতাযুক্ত দর্শন ১৮৭৭-এ প্রদর্শন করেন তা আজকেও আমরা অনেকে তথাকথিত নারীবাদীরা হজম করতে পারবো না। অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানদা তিন পুত্র-কন্যা নিয়ে একা ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন। আধুনিকতার অন্য রূপ অবশ্যই সাহসিকতা। দুঃসাহসিকতার দরজার চাবি তিনি আপামর ক্লীব বাঙ্গালিকে সেদিন দেন। আরও একটা ঘটনা যা প্রতিষ্ঠিত করবে যুগবিবর্তনের কাণ্ডারি ছিল ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৬,গভর্নর লরেন্স সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সেদিন ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে একা জ্ঞানদাই গিয়েছিলেন। সেদিনও তিনি অন্তঃসত্ত্বা। পাথুরিঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেদিন নাকি ক্রোধে লজ্জায় পার্টি ছেড়ে চলে যান। কারণ অন্তঃপুরের পদক্ষেপ যে রাজপথে। যা অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। যখন সে সমাজে অনেক সংশয় তখন জ্ঞানদা আরও দুটো পথ দেখালেন। সান্ধ্য ভ্রমণ ও জন্মদিন পালন। পাঁজি পুঁথির বাইরে বিশ্বসত্তার সঙ্গে বাঙ্গালির যোগাযোগের টিকিট সেদিন জ্ঞানদার হাতেই ছিল। সাহিত্যে প্রবেশ না করলে, কলম না ধরলে নবজাগরণ পূর্ণতা পায় না। তাই দেবেন্দ্রনাথের একাদশতম সন্তান, ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা না বললেই নয়। কলমে আধুনিকতার সিগনেচার তিনিই প্রথম সৃষ্টি করলেন। উদার সমাজ ভাবনা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা কী বাদ রাখলেন তিনি! তিনিই প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক। পর্দা ছেড়ে তিনিই কাশীবাগানের থিওসফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে যোগ দেন। উনিশতম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রী তিনিই ছিলেন। মহিলাদের সার্বিক উন্নতির চেষ্টায় মাদাম ব্লাভাটস্কির দলভঙ্গের পর স্বর্ণকুমারী সখি সমিতি গঠন করেন। তিনি মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্য মহিলা শিল্পমেলা এবং বিধবা শিল্পাশ্রম গঠন করেন। সামাজিক পরিবর্তনে তাঁর কলম ছিল নিঃশব্দ বিপ্লব। পর পর সামাজিক উপন্যাস 'দীপনির্বাণ', 'ছিন্নমুকুল', 'হুগলীর ইমামবাড়া', 'বিদ্রোহ', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে' কার্যত বদলে দিয়েছিল রক্ষণশীল সমাজকে এবং নারী স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ। তৈরি হচ্ছিল চেতনার ফেমিনিজম। কখনো কখনো মনে হয় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের এই বিদুষীরা উপযুক্ত জল, আলো, মননে মুক্ত জীবনের এবং বুকভরা বাতাস দিতে পেরেছিলেন বলেই রবিঠাকুর অঙ্কুরিত হতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দিদি শরৎকুমারী একদিন লিখছেন, '' ফুলের তোড়ার বাঁধন। বাঁধন যেদিন ছিঁড়লো সেদিনই জানা গেল কাদম্বিনী কে ছিলেন।'' রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান' ভারতী পত্রিকার প্রকাশে সদর্থক ভূমিকা নেন, যা তৎকালীন সমাজ জাগরণের হুইসেল ব্লোয়ার ছিল। ছাপার অক্ষরে কাদম্বিনীর নাম পাওয়া না গেলেও তিনি বহু চিরাচরিত বস্তাপচা তৈরি করা প্রচলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সমাজকে দিশা দেখান। হাজার নিন্দা উপেক্ষা করে নিজে ঘোড়ায় চড়ে তিনি যেতেন গড়ের মাঠে। যখন

জ্ঞানদানন্দিনী

কাদম্বরী দেবী

স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে ঠিক-বেঠিকের, উচিত-অনুচিতের প্রতিনিয়ত দড়ি টানাটানি চলছে তখন পরিবর্তনের রশি ধরলেন নতুন বৌঠান। অনেক বড়ো বার্তা সবাই পেল যেদিন উনি সুপুরি কাটার পরেও, সংসারে অনেক উপেক্ষার পরেও সাহিত্যচর্চার উদ্দেশে ঠাকুরবাড়ির তিনতলায় নন্দন কানন তৈরি করেন। রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা— এর বাইরেও যে একটা জগৎ থাকবে, যে জগতে ভাবনা, চর্চা, যুক্তি আধুনিকতার বলাকা হয়ে উড়বে তার আকাশটুকু যেন কাদম্বিনীর হাতেই মেঘমুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নবজাগরণে অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু অনেকেই ভুলে যাই তাঁকে তৈরি করেছেন আরও এক অন্দরমহলের নায়িকা, সেজ জা নীপময়ী। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে মৃণালিনী সেকালের এক সিম্বল চরিত্র। যিনি লোরেটো হাউসে ভর্তি হলেন। পিয়ানো বাজানো থেকে সংস্কৃত শিক্ষা, রবি ঠাকুরের লেখার অনুবাদ, আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পার্থিব সুখ বিসর্জন, গায়ের গয়না দান– কী করেননি! ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের মহিলারা এক একটা রবি ছিল, যাদের স্বতন্ত্র জীবন ভঙ্গিমা এক একটা নতুন পথ দেখিয়েছে। তাঁদের আলাদা করে অনেক সময় মনে করা হয. না কিন্তু যুগ বিবর্তনের কালে তাঁরা আনাচে কানাচে অনেক দাগ রেখে গেছেন যা পরবর্তীকালে সমগ্র বাঙ্গালি জাতিকে এক মুক্ত জীবনের পাদপীঠে উপনীত করেছে। ঠাকুরবাড়ির আরও এক মহিয়সী রবিঠাকুরের ভাইঝি সরলা দেবী নিঃসন্দেহে ইতিহাস তৈরি করেছেন। মহিলাদের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রথম সারিতে অবস্থানের দরজা খুলে দেন তিনি। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল এবং ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদন গঠন করে কমপক্ষে তিন হাজার মহিলাকে শিক্ষাদান করেন তিনি।

সমাজের পরতে পরতে তখন যে যে ভাবে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল তাতে কোনো না কোনো ভাবে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল ছিলই ছিল। শেষমেশ চেটেপুটে বাঙ্গালির পাতে মডার্ন টাচ ঠাকুরবাড়ির হাতা-খুন্তি। যখন ভিতরের কক্ষে মহিলারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা আঁকা নিয়ে বিবর্তনের পালে একটার পর একটা হাওয়া দিচ্ছেন ঠিক তখনই হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী রান্নাঘরে আধুনিক সব রেসিপি সাজাচ্ছেন। ' পুণ্য' পত্রিকার সম্পাদনা করতে করতেই পত্রিকায় প্রথম রেসিপি আত্মপ্রকাশ করলে তা যেন গৃহিণীদের রাঁধার ছলে পড়ার বা পড়ার খেলায় রাঁধার মশলা দিল। বোধহয় প্রথম ফ্যামিলি অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট লেখনী প্রজ্ঞাসুন্দরীর হাত ধরেই। পরবর্তীতে মেনুকার্ড উনিই চালু করেন। একটা সময় থেকে অন্য আরেকটা সময়ের সিঁড়িতে উত্তীর্ণ হতে যখন বাঙ্গালি অনেক পথিকৃতের দ্বারা লালিতপালিত ঠিক তখনই সেই প্রক্রিয়ায় ললিত বেগে আধুনিকতার স্পর্শ আনলো ঠাকুরবাড়ির মহিলাকুল।

সারা দেশ যখন দিগ্‌ভ্রান্ত ,তখন ঊষার সবটুকু লালিমা পশ্চিম থেকে পূবের আকাশে যাঁরা যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়ে গেছে তথাকথিত প্রচারবিমুখ বিশেষত্বহীন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। □

বাংলা নববর্ষের ধরন পালটালেও উৎসব একই থাকবে

(বাংলা নববর্ষে দক্ষিণাকালীর শ্রীচরণ ছুঁয়ে নতুন খাতার শুভারম্ভ করতে অভ্যস্ত বাঙ্গালি। তারই ইতিবৃত্তান্ত স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে জানালেন কালীঘাট মন্দিরের সেবাইত রঘু রায়।)

স্বস্তিকা : বাংলা নববর্ষের সঙ্গে কালীঘাটের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পয়লা বৈশাখের দিন এখানে কীভাবে পুজো অনুষ্ঠিত হয়?

রঘু রায় : পয়লা বৈশাখে রাত ১টায় কালীঘাট মন্দিরের মায়ের গর্ভগৃহ খোলা হয়। সারা বছরে এই একটি বিশেষ দিনেই মায়ের মন্দির এত তাড়াতাড়ি খোলা হয়। শুধুমাত্র গর্ভগৃহই খোলা থাকে। দর্শনার্থীদের জন্য দ্বারগুলো বন্ধ রাখা হয়।

স্বস্তিকা : ওই সময়ে কি মায়ের বিশেষ পুজো হয়?

রঘু রায় : না, মায়ের নিত্যপুজো হয়। প্রথমে অভিষেক, শৃঙ্গার, তারপরে মঙ্গল আরতি। আসলে বাংলা নববর্ষে কালীঘাটে একসময় প্রচুর ভিড় হতো। আগের দিন রাত ১২টা থেকে সাধারণ দর্শনার্থী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের খাতা, বইপত্রের ডালার লাইন পড়ে যেত। চাপ সামলানো যেত না। তাই নিয়ম করা হলো, রাত ১টায় মন্দির খোলা হবে। সেই থেকে শুধুমাত্র পয়লা বৈশাখের জন্য এই নিয়ম বহাল রয়েছে।

স্বস্তিকা : কালীঘাটে হালখাতার পুজোর সঙ্গে কি কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে?

রঘু রায় : বাপ-ঠাকুরদাদের মুখে শুনেছি, বহু আগে গ্রামবাঙ্গলায় জমিদারেরা প্রজাদের কাছে যে বকেয়া খাজনা আদায় করতো, তার জন্য পয়লা বৈশাখ দিনটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেই দেখাদেখি মহাজনেরাও তাদের ধার-দেনা আদায় করতো ওই দিনেই। সেই সময় মহাজনেরা মায়ের মন্দিরে এসে গণেশ দেবতার সংকল্প করে ব্যবসার নতুন খাতা পুজো করাতেন। সেই থেকেই বোধহয় হালখাতার পুজোর প্রচলন। আজও তাই হালখাতায় মায়ের চরণে খাতা ছুঁইয়ে গণেশ ও লক্ষ্মী পুজো করা হয়। কালীঘাট শক্তিপীঠ। তাই ধর্মানুরাগীরা মায়ের দোরে এসে শুভকাজের সূচনা করেন।

স্বস্তিকা : আগে যেভাবে হালখাতার পুজো হতো, আর এখন যেভাবে হয় তার মধ্যে কি কোনো বদল লক্ষ্য করেন?

রঘু রায় : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল তো হয়েছেই। তখনকার আর এখনকার পরিস্থিতির মধ্যে একটা তফাত দেখা যায়। ইদানীং ইংরেজি নববর্ষেই ভিড়টা বেশি হয়। আগেই বলেছি আগের দিন রাত্রি থেকে লাইন পড়তো। এখন সেসব নেই। ভোরবেলায় ভক্তরা আসেন। নমো নমো করে পুজো সারেন। একসময় যেখানে চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম হতো সেটা আর হয় না।

স্বস্তিকা : বেশি ভিড় কাদের হয়?

রঘু রায় : পয়লা বৈশাখে বাঙ্গালিদের ভিড় বেশি হয়। তবে সারাবছর এখানে অবাঙ্গালিরাই বেশি আসেন। কারণ সারাদেশ থেকে মানুষ কালীঘাটের শক্তিপীঠে আসেন, দক্ষিণাকালীকে নিজের প্রার্থনা জানাতে।

স্বস্তিকা : এই যে বললেন, পয়লা বৈশাখের তুলনায় ১ জানুয়ারি বেশি ভিড় হয়। যদি ধীরে ধীরে বাংলা নববর্ষ হারিয়ে যায়, তাহলে কী কী সমস্যায় পড়তে হতে পারে?

রঘু রায় : বাংলা নববর্ষ হারিয়ে যাওয়া মানে তো গোটা বাঙ্গালি জাতিটাই লুপ্ত হয়ে গেল তাই না। তবে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালি আর যাই করুক, নিজের বাঙ্গালিয়ানা বিসর্জন দেবে না। আমাদের এখানে সেবাইত, পাণ্ডা, পুরোহিত অধিকাংশই বাঙ্গালি। কিছু ওড়িয়া ব্রাহ্মণ আছেন। তাদেরও তিন-চার পুরুষ কলকাতায় বাস। এখানে যত ডালার দোকান, ছোটো ব্যবসায়ী সবাই বাঙ্গালি। তাই সময় অনুসারে পয়লা বৈশাখের পসার হয়তো কমেছে। কিন্তু বছরের অন্যান্য সময়ে তা পুষিয়ে যায়। করোনার সময় খুব কম মানুষ এখানে হালখাতার পুজো দিয়ে গেছেন। সবরকম নিষেধাজ্ঞা মেনেই পুজো হয়েছিল। সেই ক্রাইসিস তো শুধু বৈশাখ মাসেই হয়নি বা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই হয়নি। কালীঘাট একটা কিংবদন্তী। সভ্যতার শেষ পর্যন্ত কালীঘাট নিজের বাঙ্গালিয়ানা বুকে নিয়ে অক্ষয় থাকবে। বাংলা নববর্ষের ধরন পালটাতে পারে কিন্তু উৎসব একই থাকবে।

নববর্ষ : পথ হারানোর মধ্যেই পথের দিশা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' কপালকুণ্ডলার এই জিজ্ঞাসা পথ হারানো নবকুমারকে। বঙ্কিম-কলমে এই মাণিক্য বাক্য আজও বাংলাসাহিত্যের অসাধারণ অমূল্য এক সম্পদ। এই বাক্যের হীরক দ্যুতিতেই চোখ ধাঁধাচ্ছে— গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বাংলা নববর্ষের সব ভাবনা চিন্তা।

মনে হতে পারে, এ যেন 'ধান ভানতে শিবের গীত।' মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলা নববর্ষ নিয়ে ইদানীং যা হচ্ছে অথবা এর ইতিহাস নিয়ে যত কথা বলা হচ্ছে, তাতে সত্যিই 'নবকুমারের' মতো পথ হারাবার দশা।

অনুবাদে হ্যাপি নিউ ইয়ার : শুরুটা 'শুভ নববর্ষ' দিয়ে। বিভ্রান্তি ওখান থেকেই। কোন নববর্ষের শুভ কামনা এটি? ইংরেজি 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর আক্ষরিক অনুবাদ নয়তো! এই শুভ কামনা জানানোর মধ্যে আছে কি অন্তরের কোনো যোগ? নতুন বছরের প্রণাম, আশীর্বাদ, ভালোবাসা জানানোর যে রীতি স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত পয়লা বৈশাখকে এক বিশেষ মাত্রা দিত— আজ তা প্রায় অনুপস্থিত। চলভাষে 'শুভ নববর্ষ' বলার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের যান্ত্রিকতা। চিঠি লেখার পাট চুকিয়ে সমাজমাধ্যমে এই যে বার্তা বিতরণ, আধুনিকতা অথবা বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলে যদি এটাকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আর একদা শাসক ইংরেজের সাহেবিয়ানার কায়দায় বাংলা বছরকে স্বাগত জানানোর অসুবিধা কোথায়? বাঙ্গালির চিরাচরিত পিঠে-পায়েস, মিষ্টি বা মাছ-মাংস ভাতের ভোজের বদলে কেক প্যাস্ট্রি অথবা হোটেল রেস্তোরাঁর বিরিয়ানি, চিকেন চাপ বা ফিরনির রমরমাতে তাহলে আপত্তি কোথায়?

এ এক উৎকেন্দ্রিকতা : আসলে আপত্তি নয়, পথ হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দেশজ সংস্কৃতি থেকে উৎকেন্দ্রিকতার ভয়। নিজেদের ঐতিহ্যকে বস্তাপচা বলে 'উট-কপালে' হয়ে পথ চলায় গভীর বিবরে প্রবেশের আতঙ্ক থেকেই উঠে আসছে এসব কথা।

পয়লা বৈশাখ যে বছরের সূচনা তার নাম বঙ্গাব্দ। শব্দটির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। দিলেই বোঝা যাবে গলদটা কোথায়? বঙ্গাব্দ একেবারে সংস্কৃত শব্দ। বঙ্গের সঙ্গে অব্দ যোগে তৈরি এই শব্দ। এদেশে প্রচলিত বিক্রমাব্দ বা শকাব্দর মতোই একবারে দেশজ শব্দ। অব্দর

মতোই সংবতও। এখন অবশ্য জুড়ে দেওয়া হয় দুটি বিদেশি শব্দকে কখনও ভুল আবার কখনও সঠিক প্রয়োগে। শব্দ ব্যবহারের আগে সচেতন না হওয়ার ভ্রান্তি।

বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে :

এসব আলোচনায় ইতি টেনে এবার বরং অগ্রসর হওয়া যাক বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বঙ্গাব্দ প্রচলনের পেছনে রয়েছে ইসলামি সংস্কৃতি। তাঁরা বলছেন, বঙ্গাব্দর প্রবর্তক মুঘল বাদশাহ আকবর। তাঁর 'তারিখ ইলাহি'-তেই বঙ্গাব্দের শুরু। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দকে শূন্য বছর ধরে প্রবর্তন বঙ্গাব্দর। আর সে কারণেই খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে ফারাক ৫৯৩ ও ৫৯৪ বছরের। বৈশাখ বা এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে পৌষ বা ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ৫৯৩ বছর এবং জানুয়ারি থেকে ১৪ এপ্রিল বা পৌষের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র পর্যন্ত ৫৯৪ যদি খ্রিস্টাব্দ থেকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে পাওয়া যাবে বঙ্গাব্দকে।

আকবরকে যেমন বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলা হচ্ছে, একদল ঐতিহাসিক আবার সে কৃতিত্ব দিতে চান বাঙ্গলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে (১৪৯৪ থেকে ১৫১৩)। এই দাবি মেনে নিলে ধরে নিতে হবে আকবরেরও বছর পঞ্চাশ আগেই চালু হয়েছিল বঙ্গাব্দ।

অন্য আরেকদল ঐতিহাসিক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসেবে সপ্তম শতকে গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্কের কথা বলছেন। তাঁদের কথা, শশাঙ্কই দেশে প্রচলিত তৎকালীন বিক্রমাব্দ বা শকাব্দের মতো নিজেকে অক্ষয় করে রাখার জন্য বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

আকবর বা হোসেন শাহর দাবির পালটা ওঠা এই তথ্যকে মান্যতা দেওয়ার পেছনে কিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে। নীতীশ সেনগুপ্তর 'ল্যান্ড অব টু রিভার্স' বইতে আছে, বাঁকুড়া জেলার দুটি গ্রাম দিহরগ্রাম এবং সোনাতপনে রয়েছে দুটি প্রাচীন শিবমন্দির। টেরাকোটার ওই মন্দির দুটির বয়স কম করে হাজার বছর বলে অনুমান। ওই দুটি মন্দিরের গায়ে খোদিত লিপিতে 'বঙ্গাব্দ' শব্দটি পাওয়া গেছে। এই তথ্য বলছে আকবরের অন্তত পাঁচশো বছর আগে বঙ্গাব্দ প্রচলিত ছিল। আর এটাই শশাঙ্কের দাবিকে অনেকটাই জোরদার করছে।

পটভূমি :

এইসব ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে আরও আলোচনার আগে বিক্রমাব্দ এবং শকাব্দ সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার।

বৈদিক যুগ থেকে বেদাঙ্গর অন্তর্ভুক্ত 'জ্যোতিষ'-এর চর্চায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রাখে প্রাচীন ভারত। বর্তমানে যেসব হিন্দু পঞ্জিকা প্রচলিত তার বেশিরভাগই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিদ্যার ফসল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সংস্কার করে পরবর্তীতে যে সূর্যসিদ্ধান্ত নামের গ্রন্থ লেখা হয়, সেটাই এইসব গ্রন্থরচনা এবং জ্যোতিষ চর্চার আধার।

একসময় সারা ভারতে মোটামুটি একই ধরনের হিন্দু বা পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকা চালু থাকলেও মধ্যযুগ থেকে শুরু হয় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে ভরা নানা পঞ্জিকার অভিযাত্রা। এসবের মধ্যে আছে নেপালের সরকারি নেপালি পঞ্জিকা এবং ভারতের বাংলা, পঞ্জাবি, ওড়িয়া, মালয়ালম, কন্নড়, টুহু, তামিল পঞ্জিকা, বিক্রম সংবৎ এবং কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত শালিবাহন পঞ্জিকা। নানা বৈচিত্র্যে ভরা এই পঞ্জিকাগুলিতে কিন্তু বারোটি মাসের নাম একই। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের প্রথম মাসটি বিভিন্ন। বৈদিক বা হিন্দু পঞ্জিকা মতে সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়। অন্যদিকে খ্রিস্টান পঞ্জিকায় রাত বারোটা থেকে পরবর্তী রাত বারোটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হয় একদিন। আর সে কারণেই বাংলা ও ইংরেজি তারিখের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়।

নববর্ষ অগ্রহায়ণে : প্রাচীন বৈদিক পঞ্জিকায় বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসে (অগ্র অর্থাৎ প্রথম আর অয়ন অর্থাৎ সূর্যের গতি, দুয়ে মিলে অগ্রহায়ণ। এই মাসটিকে মার্গশীর্ষও বলা হয়। এই মাসে সূর্য বিষুবরেখা পার হয়। পৃথিবীর সরণের কারণে এখন বিষুবরেখার অবস্থান চৈত্র মাসে। পৃথিবীর এই সরণের কারণেই ঋতুর যে সময়কাল নির্দিষ্ট রয়েছে তার ক্ষেত্রেও ঘটেছে পরিবর্তন। কিন্তু পৃথিবীর ওই সরণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আর তেমন কোনো গণনা না করার কারণেই আমরা ঋতু কালের অস্বাভাবিকতার কথা বলি। অথচ বিজ্ঞান মতেই এটাই স্বাভাবিক হওয়ার কথা।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর অক্ষের সম্পূর্ণ সময়কাল ২৫,৮০০ বছর। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, আনুমানিক চার কিংবা পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিষুবরেখা ছিল অগ্রহায়ণে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি প্রচলিত বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবৎ এবং শকাব্দ বা শালিবাহন পঞ্জিকা। ঐতিহাসিক তথ্য, ৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উজ্জয়িনী রাজ বিক্রমাদিত্য শকদের হারানোর বিজয়-উৎসব উপলক্ষ্যে চালু করেন বিক্রম সংবৎ ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে।

অন্যদিকে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাতবাহন-রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শকদের পরাজিত করে চালু করেন শকাব্দ। তাই খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮-৭৯ বছর বিয়োগ করলে অথবা খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে ৫৬-৫৭ যোগ করলে পাওয়া যাবে যথাক্রমে শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ।

বঙ্গাব্দ নিয়ে আরও :

বাদশাহ আকবরের সময় রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য চান্দ্র বৎসর হিজরিকে দেশে প্রচলিত সৌর বৎসরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারিখ ইলাহি প্রবর্তন করা হয়। অমর্ত্য সেনের মতে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। কেননা চান্দ্রবৎসর হিজরির প্রথম এবং শেষ মাস কোনো একটি নির্দিষ্ট ঋতুভিত্তিক নয়। তাই ফসল কাটার ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতেই আকবর এই বদল ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আইন-ই-আকবরি থেকে শুরু করে সেই সময়ের কোনো দলিল দস্তাবেজেই বঙ্গাব্দ শব্দটি নেই। আকবর বঙ্গাব্দর প্রচলন করলে তার উল্লেখ থাকত। তবুও 'পথ হারানো'র কারণেই বঙ্গাব্দর প্রবর্তক হিসেবে বলা হয় আকবরের নাম। এই ভ্রান্তি দূর করে সঠিক পথ নির্দেশের জন্য তাই প্রয়োজন কোনো এক 'কপালকুণ্ডলা'র। না হলে ভুল জেনে ভুলের ভুলভুলাইয়াতেই পাক খেতে হবে।

বঙ্গজীবনে পয়লা বৈশাখ :

যে কোনো সুচনার সঙ্গে যোগ থাকে একটা শুভ বোধ ও মঙ্গল প্রার্থনার। স্বভাবতই বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখও বিশেষ করে বঙ্গজীবনে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। পয়লা বৈশাখের বিশেষ কৃত্য হিসেবে এদেশে প্রচলিত স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে কোনো বিধি বা নির্দেশ নেই। এ সম্পর্কে পঞ্জিকায় ধ্বজারোপণ ইত্যাদি যেসব কথা লেখা থাকে তার আকর জানা নেই। এক কথায় তা অজ্ঞাত। তাই নববর্ষে কোনো ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় আচার পালনের সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ নেই।

কিন্তু হিন্দুজীবনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে অবধারিত ভাবে জড়িয়ে আছে শুদ্ধি-শুচিতা পালনের মাধ্যমে গৃহদেবতা অথবা গ্রাম বা শহরের কোনো মন্দিরে পূজার্চনা করার এক অলিখিত সংস্কার। সে কারণেই মন্দিরে বা বাড়িতে বিশেষ পূজার সঙ্গেই লক্ষ্মী ও গণেশের পূজাও করা হয়। বিশেষ করে যে কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রেই। গ্রামীণ পরিবারে বহু ক্ষেত্রে গোয়ালে হয় গো-পূজন।

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে পয়লা বৈশাখ বা নতুন বছর উপলক্ষ্যে নতুন জামাকাপড় পরা, সঙ্গতি অনুযায়ী কিছু দান ধ্যান। পারস্পরিক মঙ্গল কামনায় প্রণাম, আশীর্বাদ দেওয়া এবং স্নেহ ভালোবাসা বিনিময় করাটা লৌকিক আধারে বঙ্গজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওই সঙ্গে বাড়িতে কিছু ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শিদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া নববর্ষেরই অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আগের দিনে ছিল কিছু প্রমোদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমবেত ভাবে স্থানীয় চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারি তলায়। এখন সে সবে এসেছে পরিবর্তন। উদ্দামতাই ক্রমে বড়ো হয়ে উঠছে এসব অনুষ্ঠানে। সামাজিক অবক্ষয়ে মধ্যবিত্ত অনুপরিবারে পানাহারের বাহুল্য জীবনের শেকড় ছেঁড়ার একটা আশঙ্কা হয়ে উঠেছে। একটি বড়ো রকমের ধাক্কা না খেলে এই জীবনচর্যার বদল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

হালখাতা :

পয়লা বৈশাখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হালখাতার অনুষ্ঠানটি। তারও আগে কৃষিনির্ভর এদেশে দিনটি 'হালকামাই' বা চাষ বন্ধ এবং উৎপন্ন ফসল দিয়ে খাজনা দেওয়ারও একটা পর্ব ছিল। পরবর্তীকালে এটি ব্যবসায়ী মহলের নতুন হিসেবের খাতা খোলার উৎসব। লক্ষ্মী, গণেশ ও নতুন খাতার পুজো, খাতায় টাকার ছাপ দিয়ে শুভ মহরত এর অঙ্গ। সেই সঙ্গে এটা ছিল খরিদ্দার ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলনের একটি দিন। সেদিনে সন্ধ্যার সেই আয়োজনে একদা ছিল উভয়ের আমেজ। পরিষ্কার করা দোকান, ব্যবসাকেন্দ্রকে সুসজ্জিত করে আপ্যায়িত করা হতো সকলকে ঠাণ্ডা পানীয় ও মিষ্টান্ন ভোজে। সেইসঙ্গে গত বছরের বকেয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে আগাম কিছু অর্থ জমা দেওয়ার রেওয়াজও ছিল। ব্যবসায়ীরা তো বটেই, এমনকী গ্রামের চিকিৎসকদের হালখাতার আয়োজন করতে দেখা গেছে।

এটিও প্রায় অবলুপ্তির পথে। কলকাতায় সোনার দোকানে রেওয়াজটা এখনও আছে। অন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই আন্তরিক আপ্যায়ন নয়, মিষ্টির প্যাকেট হাতে ধরিয়েই ইতি টানা হয় এই উৎসবের।

কিন্তু হিসেব নিকেশ সবই ইংরেজি বছর অনুযায়ী হওয়ায় এবং সেক্ষেত্রেও কম্পিউটারের ব্যবহারের জন্য নতুন খাতাটি আজ পশ্চিমে ঢলা সূর্যের মতোই ডুবে যাচ্ছে কোনো এক গভীরে।

নেই সেই আড্ডাটিও :

কলেজ স্ট্রিট বা বই পাড়াতেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল পয়লা বৈশাখের দিনটি। নতুন বইয়ের প্রকাশ, লেখকদের সঙ্গে আড্ডা, খাওয়া হয়ে উঠেছিল বঙ্গসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল ছবি। কিন্তু সে ছবিও আজ বিবর্ণ। পয়লা বৈশাখ নয়, নতুন বই বের হয় এখন 'বইমেলা'য়। সাহিত্যিকদের আড্ডাও এখন প্রায় ডোডো পাখি। সব মিলিয়ে নববর্ষ নিয়ে সব ভাবনাতেই এখন যেন 'পথ হারানোর' সংকেত। তবে ওই সংকেতের মধ্যেই রয়েছে নতুন পথ খুঁজে পাওয়ারও ইঙ্গিত। নতুন সূর্য তো উঠবেই! এই প্রত্যয়েই তাই বলা স্বাগত নববর্ষ— মঙ্গল ও কল্যাণের সঙ্গে শুভবোধের আলোয় ভরে উঠুক দিগন্ত। □

নব আনন্দে জাগো আজি

বাঙ্গালি কি ক্রমশ তার শেকড় হারিয়ে ফেলছে? নববর্ষকে প্রেক্ষাপটে রেখে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চলতি সময়ের দুই খ্যাতিমান মানুষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাঙ্গালির প্রিয় নববর্ষ বাঙ্গালিয়ানায় পূর্ণ। কত সৃষ্টি, কত গান, কবিতা, উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে এই বৈশাখের পয়লা দিন। পলাশের রং লাগিয়ে ফাগুনের দোলায় চেপে যখন বৈশাখ উঁকি দেয় নতুনের গন্ধ মেখে, তখন সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙ্গালির রসসাহিত্যেও ঘটে নতুনের আবির্ভাব। বসন্তের বিদায়বেলায় আরও একবার নতুন রূপে ঋতুচক্রকে বরণ করে নেবার পালা। শিকড়ের টানে সাড়া দিয়ে বিশ্বজুড়ে বাঙ্গালি তার বাঙ্গালিয়ানা বজায় রেখে তার প্রকাশ ঘটায়। সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে মণিমাণিক্য বের করে পয়লা বৈশাখের পসরা সাজায় বাঙ্গালি। আত্মপরিচয়ের গর্বে ভরে উঠে নতুন করে সাংস্কৃতিক মঞ্চগুলোয় কচিকাঁচা থেকে তরুণ-তরুণী সকলেই মেতে ওঠে বাঙ্গালিয়ানার নিজস্ব কলায়।

জীবনের দৌড়ে ব্যস্ত শহর কিংবা গ্রাম, বছরের শুরুর এই দিনটায় আনন্দোৎসবের সঙ্গে নতুনকে বরণ করে নেয়। ছোটোরা নতুন জামা পরে গুরুজনেদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করে নতুন বছর। বাঙ্গালি হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজিত হয় বাঙ্গালির আরাধ্য দেবতা লক্ষ্মী-গণেশ। মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করেন ব্যবসায়ীরা। হালখাতা পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় ব্যবসার নতুন বছর। শহরের বুকে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে বাঙ্গালি। গ্রামগঞ্জের মানুষ এক সুতোয় বাঁধা পড়ে আনন্দের আয়োজন করেন গ্রামীণ বৈশাখি মেলায়।

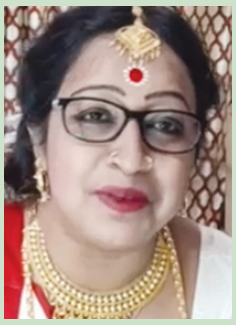

কাবেরী পুইতণ্ডি (কর)
প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় নৃত্য শিল্পী—

বাঙ্গলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে একটি হলো গৌড়ীয় নৃত্য। বর্ষবরণ যেহেতু বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব তাই এই উৎসবে গৌড়ীয় নৃত্যের প্রাসঙ্গিকতা থেকেই যায়। এই নৃত্য কলার একটি অংশ হলো 'গণেশ বন্দনা'। সকল দেবতার আগে দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা হয়। তাই বছরের শুরুর দিন লক্ষ্মী-গণেশের পুজো দিয়ে নতুন বছরকে আবাহন করি আমরা গণেশ বন্দনার মাধ্যমে। বাঙ্গলার যে স্থাপত্য ভাস্কর্যের ঐতিহ্য রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে গৌড়ীয় নৃত্যের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় নৃত্য শিল্পের যে দুটি বিভাগ 'তাণ্ডব ও লাস্য'— এই দুটি ভাবই সমানভাবে বিদ্যমান গৌড়ীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্য যে যে উৎসের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাস, স্থাপত্য ভাস্কর্য, গুরু পরম্পরা, লোকায়ত সংগীত ও নাট্য শাস্ত্র— গৌড়ীয় নৃত্যে এই সকল ধারাই বিদ্যমান। তবে হ্যাঁ, বাঙ্গালি চিরকালই নিজের সম্পদে উদাসীন, তাই গৌড়ীয় নৃত্যের প্রচার বা প্রসার সেভাবে হয়নি। যদিও মিনিস্ট্রি অব কালচার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ ফেলোশিপ সবই প্রদান করছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার এক শ্রেণীর মানুষ এটিকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের শিরোপা দিতে নারাজ। তবে আমার মনে হয় বাঙ্গালির পয়লা বৈশাখ পালন শুধুমাত্র ভালো খাওয়াদাওয়া, নতুন জামা পরা বা হালখাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বাঙ্গলার লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে পুনরায় সগৌরবে প্রতিস্থাপন করার মধ্য দিয়ে পালিত হোক।

প্রবুদ্ধ রাহা
প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী

বঙ্গ সংস্কৃতির যতগুলি ধারা আছে সে সকল ধারার কোনো একটি ধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তবেই আমরা নববর্ষ পালন করি। খুব ছোটোবেলায় স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ করতাম। পরবর্তী সময় যখন কলেজে পড়ি নিজের কলেজে বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে খুব আড়ম্বরের সঙ্গেই পয়লা বৈশাখ পালন করেছি। ইংরেজি নববর্ষ পালনে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে যেমন একটা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পাই, বাংলা নববর্ষ কিন্তু অনেক সুশৃঙ্খল এবং বাঙ্গালি আভিজাত্যপূর্ণ।

সর্বোপরি বাংলা ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে বাঙ্গালির জীবনে, তাই শিকড়কে আঁকড়ে ধরেই বাংলা নববর্ষ পালিত হোক দিকে দিকে। যদিও আজকের প্রজন্ম ইংরেজি বা হিন্দি ভাষার প্রতি বেশি ঝুঁকছে কিন্তু তাদেরও শিকড় চিনিয়ে দেওয়ার কর্তব্য বা দায়িত্ব আমেদেরই হাতে। □

বেড়ার ওপারে অবমানিত বাঙ্গালিয়ানা

নিখিল চিত্রকর

দুই বঙ্গ। মাঝখানে কাঁটাতার। এপারে পশ্চিম। ওপারে পূর্ব। পূবেরটা এখন বাংলাদেশ। এপারে পশ্চিমবঙ্গ। ভাষা বাংলা, সত্তা বাঙ্গালি। তবুও দুই বাংলার মাঝে দূরত্ব অসীম। ব্যবধান শুধু কাঁটাতারের নয়। ব্যবধান মননশীলতারও। অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃতির। একসময় ভূভারতে জীবনযাপন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভাষা, এবং শিক্ষার পরিমার্জিত ব্র্যান্ড ছিল বাঙ্গালিয়ানা। সময়ের নিরিখে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই বাঙ্গালিয়ানা এখন 'আমাগো' বনাম 'তোমাগো'-তে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বড়ো বেশি নিজেদের গায়ে ইসলামিক তকমা লাগাতে ব্যস্ত। জাতিসত্তা ছাড়িয়ে ধর্মই তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠছে।

রবিঠাকুর হিন্দুদের কবি, নজরুল বাংলাদেশের— ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের পোস্ট প্রায়ই চোখে পড়ে। পোস্ট করে থাকেন ওপার বাংলার তথাকথিত শিক্ষিতরা। কোনো কোনো বাংলাদেশি ফেসবুক কলমচি হুলিয়া জারি করেন, 'পয়লা বৈশাখ হিন্দুদের উৎসব। বাংলাদেশে এসব নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।' পড়শি দেশে ১লা বৈশাখ বন্ধ হোক বা না হোক, ইসলামিক সংস্করণ তাকে 'পহেলা' বৈশাখের মোড়কে ঢেকে দিতে পেরেছে। আমরা এপারে বনেদি বাঙ্গালিয়ানা আত্তীকরণ করে এগিয়ে চলেছি। তাকে যুগোপযোগী করেছি। বাঙ্গালির মূল সত্তা এখনোও অক্ষয় হয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ খণ্ডে।

চুঁচুড়ায় থাকাকালীন দেখেছি বৈশাখের প্রথম দিনে গ্রামগুলো কেমন উৎসবে মেতে উঠতো। নিকোনো মাটির বাড়ির দেওয়ালজুড়ে খড়ির আলপনা। স্বস্তিক চিহ্নের আঁকিবুকি। গোবরছড়া দিয়ে মোছা উঠোনে অথবা তুলসীতলায় ছোটো ছোটো লক্ষ্মীর পদযুগল। নতুন জামা, বড়োদের প্রণাম, খাওয়া দাওয়া, বৈঠকি আড্ডা বা কুটুম্বস্বজনদের আনাগোনা--- সেসব শুভদিন উদ্‌যাপনের প্রতীকীমাত্র। আসল লক্ষ্য হলো জাতিসত্তার আবহমান সংস্কৃতিকে পরের প্রজন্মের খাতে বইয়ে দেওয়া। তাই এপার বাঙ্গলার শহর থেকে গ্রামে পয়লা বৈশাখের আবহে খাঁটি বাঙ্গালিয়ানার ফল্গুস্রোত বয়ে যায়। যা ওপার বাংলায় অমিল।

বাংলাদেশে বৈশাখের মাস পয়লায় যে উৎসব হয় তা অনেকটা লোকোৎসবের আঙ্গিক। ওরা হিসেবনিকেশের কোনো ধার ধারে না। তাই ধরেই নিয়েছে আকবর বাদশাই বাংলা নববর্ষের প্রবর্তক। সেদেশের ব্লগগুলোতে তাই লেখা হয়। সেই মোঘলাই বিশ্বাসের দরুন বদলে গেছে তাদের উচ্চারণ। এমনকী গোটা পার্বণের গায়েই লেগেছে মোঘলাই রং। নানা রঙের মুখোশ, পেঁচার বাহারি অবয়ব, লাল- সবুজের মিছিল। সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙ্গালিরা ওইদিন অবশ্য নতুন খাতার পুজো, গৃহশান্তির পুজো করেন সাবেক বাঙ্গালি রীতি মেনেই। সেখানেও মোল্লাবাদের ফতোয়া জারি হয়। শহরে প্রভাতফেরী। আর গ্রামে লোকমেলা। সেখানে জারিগান, গাজির গান, আলকাপ, মারফতি, মুরশিদি প্রভৃতি স্থানীয় লোকসংস্কৃতির প্রদর্শন চলে। এছাড়াও ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানো, মুন্সিগঞ্জে গোরুর দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, চট্টগ্রামের বলীখেলা পহেলা বৈশাখের অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের বৈশাখি উৎসবে এ রাজ্যে বসবাসকারী শহুরে থেকে জনজাতি সবাই সমানভাবে অংশ নেয়। পয়লা বৈশাখের দিন সকালে জৈড় গাছের গোড়ায় জল ঢেলে নববর্ষের সূচনা করেন জনজাতিরা। আমাদের অশ্বত্থ গাছকেই জনজাতিরা জৈড় নামে ডাকেন। গাছের গোড়ায় জল ঢেলে পুরুষরা আলিঙ্গন করেন। মহিলারা নতমস্তকে গড় করেন। গোটা বৈশাখ মাস চলে এই রীতি পালন। মমত্ববোধের অঞ্জলিতে প্রকৃতি বরণ। এও তো এপার বাঙ্গলার নববর্ষের আপন দেশ। বাংলা নববর্ষের মূল শিকড় এখনোও এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রোথিত রয়েছে। আমাদের বাঙ্গলায় যেকোনো পালাপার্বণে রবি-নজরুল সমানভাবে গৃহীত হয়।

পয়লা আর পহেলা--- শব্দবন্ধের বানানের হেরফেরে শুধু যে দেশবদলের ইঙ্গিত থাকে তা নয়, মননেও বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। হালফিলে সেই তারতম্য দেখা যায় গুগল অনুবাদেও। সেখানে যেকোনো ইংরেজি ভাষার তর্জমা দেখায় ইসলামি অনুকরণে। দেশটার সরকারি ভাষা বাংলা। অথচ ধর্মীয় অনুসরণের পথ শেষ হয় মোল্লাবাদের দোরগোড়ায়। একই সত্তার দুই ভূখণ্ড। কিন্তু রুচি ভিন্ন স্বাদের। এদেশীয় বাঙ্গালিদের পয়লা বৈশাখ আজও স্বকীয়তা বজায় রেখে অনন্য। বাংলাদেশ তার নিজস্ব ঘরানা বিসর্জন দিয়ে পথভ্রষ্ট পথিকের মতো গন্তব্য খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রথীন্দ্র মঞ্চে শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান অনুষ্ঠান

'ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সত্যি সত্যি প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কেননা প্রজ্ঞায় বিশ্লেষণ ও দূরদর্শিতা দুইয়েরই সমাবেশ হয়। তিনি যদিও কোনো পুস্তক লেখেননি, তবু তিনি এরকম একজন মনীষী ছিলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে সমাজ সংগঠনের এক অনুপম পদ্ধতি 'সঙ্ঘ শাখা' উপহার দিয়েছেন। তিনি এই সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা, রাষ্ট্রীয় একতা এবং স্ত্রী-পুরুষের সমানতার ভাবনা দিয়েছেন— এগুলি তাঁর প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।' গত ২৬ মার্চ কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কথাগুলি বলেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পরিষদের অধ্যক্ষ এবং সাংসদ ড. বিনয় সহস্রবুদ্ধে। এবছরের ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান করা হয় হিন্দি সাহিত্যের আধুনিক প্রজন্মের রাষ্ট্রবাদী মহিলা কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নিবন্ধকার ড. নীরজা মাধবকে। সম্মানস্বরূপ তাঁকে শাল ও মানপত্রে ভূষিত করার পর তাঁর হাতে একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর কুমারসভা পুস্তকালয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শ্রীমতী নীরজা মাধব বলেন, 'ব্যক্তির ভিতরে যে অনন্ত জিজ্ঞাসার উদয় হয় , তা সাহিত্য সৃষ্টি করতে শক্তি প্রদান করে। ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি অন্যের অস্তিত্ব সংকটে বিশ্বাস করে না, ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে আত্মীয় মনে করে। ভারতবর্ষের এই ভাবনাই সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।' উল্লেখ্য, ড. নীরজা মাধবকে এবছর মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহোদয় ২০২০-২১-এর সর্বোচ্চ মহিলা সম্মান 'নারী শক্তি পুরস্কার'-এ ভূষিত করেছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কুশাভাউ ঠাকরে পত্রকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বল্লভভাই শর্মা বলেন, 'ডাঃ হেডগেওয়ারের 'রাষ্ট্র সর্বোপরি' এই পবিত্র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য অনুশাসিত রাষ্ট্রভক্ত মানুষ তৈরি হয়েছে যাঁরা আজ রাষ্ট্রের জন্য সঞ্জীবনী শক্তি রূপে প্রমাণিত।' তিনি ড. নীরজা মাধবের রাষ্ট্র ভাবনায় ওতপ্রোত এবং সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য সৃষ্টির প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জয়দীপ রায়চৌধুরী 'ধন্য কেশব সঙ্ঘপ্রণেতা' বাংলা গান পরিবেশন করেন। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন নন্দকুমার লঢ়া, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, মনোজ কাকড়া, ড. রাজশ্রী শুক্লা ও সুধা জৈন। যোগেশরাজ উপাধ্যায় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ড. নীরজা মাধবকে বরণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জানান কুমারসভা পুস্তকালয়ে সম্পাদক মহাবীর বজাজ।

গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জাগৃতি বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

খড়্গপুর আইআইটি-র ছাত্র ও অধ্যাপকদের দ্বারা চালিত গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (GYWS) একটি নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যারা ক্যাম্পাসের অদূরে গোপালী গ্রামের এবং আশেপাশের মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার কাজ করে চলেছে। সোসাইটির জাগৃতি বিদ্যামন্দির (JVM) এলাকার সুযোগসুবিধা বঞ্চিত ২২০ জনেরও বেশি শিশুকে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ভাবে গুণসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

গত ২৭ মার্চ সোসাইটির জাগৃতি বিদ্যা মন্দির তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'আশায়ে'-এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিদ্যা মন্দিরের ছোটোদের আবেগঘন অংশগ্রহণ উপভোগ করার মতো ছিল। করোনা মহামারীর কারণে গত তিনবছর অফলাইনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিশেষ থিম ছিল 'প্রকৃতির পাঁচটি উপাদান।' বেশ কয়েকজনের গৌরবময় উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে বাড়তি মাত্রা দিয়েছিল। তাঁরা হলেন এসডিও ইমাজুল হোসেন, নবকুমার দাস, অধ্যাপক মঞ্জিরা সিনহা, অধ্যাপক গৌতম সেন এবং ইএফআর-এর ২য় ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ড্যান্ট সুভাষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠান গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। তারপর বেশ কয়েকটি নৃত্য ও সংগীত পরিবেশিত হয়। শিক্ষার্থীরা দর্শকদের কাছে থিম তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন স্কিটও পরিবেশন করে। তারপর অনুষ্ঠিত হয় অভিনব ড্রেস প্রতিযোগিতা । পুরস্কার বিতরণের পর ছাত্র-ছাত্রীদের গান ও নাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'আশায়ে' অনুষ্ঠান।

হাওড়ায় আরোগ্য ভারতীর কার্যকর্তা বৈঠক

গত ২৯ ও ৩০ মার্চ হাওড়া শহরের সালকিয়ায় কৃষ্ণ ভবনে আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় স্তরের প্রচারক এবং পূর্ণকালিক কার্যকর্তাদের বিশেষ বর্গ সম্পন্ন হয়। বর্গে আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সভাপতি ডাঃ রাকেশ পণ্ডিত, সংগঠন সম্পাদক ডাঃ অশোক বার্ষ্ণেয়, রাষ্ট্রীয় মহাসচিব ডাঃ সুনীল যোশী, ডাঃ মুরলীধর রাও-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০ জন অখিল ভারতীয় স্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমদিন বর্গের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি পূর্ণ সময় বর্গে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পথনির্দেশ করেন। আরোগ্য ভারতীর সারা বছরের বিভিন্ন অভিমুখ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয় এই বর্গে। সুস্থ ব্যক্তি, সুস্থ পরিবার, সুস্থ সমাজ ও সুস্থ রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে সমস্ত প্রচারক ও পূর্ণকালিকরা তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও ভাবনাচিন্তা বিনিময় করেন।

মহাবীর জয়ন্তী হোক আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতির দিন

সরোজ চক্রবর্তী

জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে 'মহাবীর জয়ন্তী' হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন জৈনধর্মের ২৪তম তীর্থঙ্কর 'মহাবীর' জন্মগ্রহণ করেন। জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো এই 'মহাবীর জয়ন্তী'। মাত্র ৩০ বছর বয়সে সংসার সুখ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন মহাবীর। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা সিদ্ধার্থ এবং মাতা ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা ত্রিশলা। কথিত আছে যে, মহাবীরের জন্মের সময় তাঁর মাতা কোনও বেদনা অনুভব করেননি। মহাবীর যৌবনেই সমস্ত রাজকীয় সুখ, গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

জৈনদের মতে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা মুক্তির পথ নির্মাতা জৈনধর্ম প্রচার করেন। তীর্থঙ্কররা সংসার দুঃখ পার হওয়ার 'ঘাট' বা 'তীর্থ' নির্মাণ করেছিলেন বলে তাঁরা ওই নামে পরিচিত। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর। প্রথম বাইশজন তীর্থঙ্করের কোনও ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায় না। ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথই ছিলেন জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। কিন্তু এই ধর্মকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করে একটি প্রভাবশালী ধর্মে পরিণত করার কৃতিত্ব শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-এর।

জৈনধর্মের শেষ প্রবর্তক মহাবীরের জন্মকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আনুমানিক ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর উপকণ্ঠে কুন্দগ্রাম বা কুন্দপুর বর্তমানে মজফ্ফপুর জেলার বসার গ্রামে জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয় রাজবংশে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম হলো বর্ধমান। তরুণ বয়সে যশোদা নাম্নী জনৈকা কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৩০ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১২ বছরের কঠোর সাধনার পর ঋদুপালিকা নদীর তীরে এক শালগাছের নীচে তিনি কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করে জিন বা জিতেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত হন এবং চিরতরে বস্ত্র ত্যাগ করে নিগ্রন্থ (গ্রন্থি হীন বা সংসার বন্ধনহীন) হন। কৈবল্যের মাধ্যমে তিনি কামাদিরিপু ও সুখ-দুঃখকে জয় করেন বলে তাঁকে মহাবীর বলা হয়। জিন থেকে তাঁর শিষ্যদের জৈন বলা হয়। সংস্কৃতে জিন শব্দটির অর্থ জয়ী। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আবেগগুলিকে জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁকেই জিন বলা হয়। জিনদের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে জৈন।

জৈনধর্ম শ্রমণ প্রথা থেকে উদ্ভূত ধর্মমত। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম পন্থগুলির মধ্যে

nmc

JAS-ANZ

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments From :

M/s. OUTBOX CARGO SERVICES LLP

SAGAR ESTATE BUILDING
2, N.C. DUTTA SARANI
ROOM NO. 2, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700001

KAMAL AGARWAL
Contact No.
M : 98300 23126
O : 91-33-40033326 / 40055518
Fax : 91-33-2230-6490
e-mail : info@outboxcargo.com

অন্যতম। জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের শিক্ষাই জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। আধুনিক বিশ্বে জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এই ধর্মমত বেশ প্রভাবশালী। ভারতবর্ষ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম ইউরোপ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জৈন মতাবলম্বীরা রয়েছেন। ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে জৈনধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈনরাই সর্বপ্রথম বর্ণ বিভক্ত সমাজের বুকে আঘাত হেনে মানুষের সমান অধিকারের দাবিকে তুলে ধরে। আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জৈনধর্ম আত্মার উৎকর্ষ ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মধ্যযুগের জৈন সন্ন্যাসীরা প্রাকৃত ও সংস্কৃতে বহু টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা খুব উৎসাহী ছিলেন। শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চাতেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জৈনদের প্রতিষ্ঠিত বিহার, মন্দির ও গুহা রয়েছে। এইসব মন্দিরে বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আজও সংরক্ষিত আছে। সিদ্ধি লাভের পর মহাবীর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মগধ, অঙ্গ, কোশল, মিথিলা, নালন্দা, রাজগৃহ, বৈশালী-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করে বহু নর-নারীকে জৈনমতে দীক্ষিত করেন। সমসাময়িক রাজন্যবর্গও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করতেন। ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৭২ বছর বয়সে রাজগৃহের কাছে পাবা নগরীতে তিনি অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

মহাবীর যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, তার মূল ছিল পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুর্যাম। এই চতুর্যাম হলো—(১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অচৌর্য অর্থাৎ চুরি না করা এবং (৪) অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত থাকা। এই চারটি নীতির সঙ্গে মহাবীর আরও একটি নীতি যুক্ত করেন, তা হলো ব্রহ্মচর্য। এই পাঁচটি নীতি পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত। মহাবীরের মতে সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান এবং সত্য আচরণ ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। এই ত্রিরত্নের সাহায্যে সিদ্ধশিলা অর্থাৎ পরম শুদ্ধ আনন্দ বা আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব।

জৈনরা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু ও চরম প্রকাশকেই ঐশী শক্তিরূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে, তীর্থঙ্করদের মধ্যেই ঐশী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চমহাব্রত পালন ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাই কর্ম ও জন্মান্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জৈনরা সকল বস্তু এমনকী পাথর ও ধাতুর মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, কোনো প্রাণী হত্যা মহাপাপ। অহিংসা, অপরিগ্রহ, কৃচ্ছ্রসাধন ও রিপুজয়—জৈনধর্ম অনুমোদিত সর্বোত্তম বৃত্তি।

জৈনধর্ম নতুন কোনও ধর্মমত নয়। হিন্দু ধর্মের চিন্তাধারা, বিশেষত উপনিষদ ও আরণ্যকের চিন্তাধারা থেকে তা উদ্ভূত। জৈনধর্মে গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে। পাশাপাশি হিন্দুরাও পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ ও মহাবীরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে থাকেন। আসলে জৈনমত হলো সনাতন হিন্দু ধর্মেরই একটি সংস্কারিত রূপ। তাই জৈনদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু শাস্ত্রের উপনিষদ ও আরণ্যকে অহিংসার কথা বহু আগে বলা হয়েছে।

সেই অহিংসাকেই জৈনরা খুব গুরুত্ব সহকারে মেনে চলেন। জৈনধর্মের মূল সূত্রগুলি প্রথমে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে তা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। জৈনশ্রমণ ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্রকে জৈনদের আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বলা যেতে পারে। চোদ্দটি পর্বে রচিত এই গ্রন্থ থেকে মহাবীরের বাণী সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত প্রথম জৈন ধর্মশাস্ত্রকে চোদ্দটি পর্বের পরিবর্তে বারোটি অঙ্গতে সংকলিত করা হয়। এগুলিকে দ্বাদশ অঙ্গ বলা হয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের বলভিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জৈন সংগীতে আবার নতুনভাবে ধর্মগ্রন্থ সংকলন করা হয়। বর্তমানে ওই সংকলন জৈন সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। জৈন সিদ্ধান্ত আবার অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র নামে চারটি ভাগে বিভক্ত। এছাড়া চতুর্বেদ, পরিশিষ্টপার্বণ প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে এই ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি জানা যায়। এইসব গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে স্থূলভদ্র, ভদ্রবাহু, হেমচন্দ্র, সিদ্ধান্ত, হরিভদ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে জৈনধর্মের প্রচার ব্যাপকভাবে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে জৈনরা মহাবীরের অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তাঁরা কোনও গ্রন্থি বা বস্ত্র ধারণ করতেন না। এই জন্য তাঁদের দিগম্বর বলা হতো। অন্যদিকে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে যে জৈনরা উত্তর ভারতে থাকতেন এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন, তাঁদের শ্বেতাম্বর বলা হতো।

জৈন মতানুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকতেন। কারণ অহিংসা হলো জৈনধর্মের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কোনওরকম আবেগের তাড়নায় কোনো প্রাণীকে হত্যা করাকেই জৈনধর্মে হিংসা বলা হয়। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈনধর্মে অহিংসা নামে পরিচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গের ক্ষতি করা জৈন ধর্মানুশীলনে নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, কীটপতঙ্গ মারার বদলে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জৈনমতে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করা ও নির্দয় হওয়াকে হিংসার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হয়। মহাবীর সৃষ্ট জৈনমতের আরও একটি আদর্শ হলো অনেকান্তবাদ। জৈনদের কাছে অনেকান্তবাদ হলো মুক্তমনস্ক হওয়া। এই ধারণাটি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করে।

মহাবীর জন্মজয়ন্তী সমগ্র দেশে পালিত হয়। তবে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে বেশ ধুমধাম করে পালন করা হয়। বিহারের ভাগলপুর, নালন্দা জেলায়, গুজরাটের গিরনার, জুনাগড়, পালিতানা, রাজস্থানের মাউন্ট আবু, কলকাতার পরেশনাথ মন্দির-সহ বিভিন্ন স্থানে জৈন ও হিন্দুরা মহাবীর জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে মহাবীরের বাণী পাঠ, জীবনী পাঠ, পুজো, প্রার্থনা, ভক্তিমূলক গান-সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জৈন মন্দিরগুলিকে পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। কোথাও কোথাও শোভাযাত্রাও বের হয়। এই দিন ভক্তরা সততা, অহিংসা ও প্রেমের ব্রত গ্রহণ করেন। পাশাপাশি সমগ্র জীবকুলকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতিরও শপথ নেন।

(মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"

24, Park Street, Kolkata - 700016

Phone :2229-8411/1031/4352, Ph. 2229-0492

e-mail : wadhwana@vsnl.com

অধ্যাত্ম মননে নববর্ষের আহ্বানে

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ— এঁরা একে তিন, তিনে এক। পুরাতন বছরের জীর্ণতা কাটিয়ে নববর্ষের সূচনাকালে ঠাকুরের ভাব বলয়কে উপলব্ধি করতে পারলে, তবেই আমরা সংকীর্ণতার স্বার্থবলয় অতিক্রম করে হৃদ্‌মন্দিরে তাঁর ভাবকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নববর্ষে চৈতন্যের রথে আরোহী হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবো। কলিকালে আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের গ্রাস করেছে। আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে অর্থ পিপাসা যুক্ত হয়ে এমন স্বার্থবলয় তৈরি করেছে যেখানে কপটতা, কটুতা ও পরশ্রীকাতরতা আমাদের চলার মূল মন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

কোলাহলের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যকে অপমানের মধ্যে দিয়ে নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠার হীন প্রচেষ্টায় আমরা আত্মনিবেদন করেছি। ফলে কলিতে কলহই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমৃদ্ধি যে পথে আসছে তাতে শান্তি নির্বাপিত হচ্ছে। সকলের সুখের মধ্যেই যে নিজের সুখ— একথা শাস্ত্রে থাকলেও, এ শিক্ষার মধ্যে সত্য থাকলেও, কলিকালে আমরা শাস্ত্র ও সত্য উভয়কেই উপেক্ষা করে অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি আর ভাবছি সবাই আমার প্রতি বিশ্বস্ত হবে। বিশ্বাসের বলয়ে বিচরণ করলে তবেই আশা করা যায় যে বিশ্বাস বলয় আমায় ঘিরে রাখবে। বহুর মধ্যে বাহুল্য আছে, বৈভবও থাকতে পারে, কিন্তু শান্তি স্বস্তি সুদূর পরাহত। একের মধ্যে নিমজ্জিত থাকলে তবেই শান্তি ও তৃপ্তি আশা করা যায়।

ঠাকুর, মা-স্বামীজী আমাদের একে স্থিত হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন। নববর্ষে সেই শিক্ষাকে সম্বল করলে তবেই নিজেকে ও নিজের পরিচিত মণ্ডলে শান্তির বলয় রচনায় আমরা কৃতকার্য হবো। ভক্তি ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। ধৈর্য শান্ত হতে শেখায়— শান্ত হলেই শান্তির পথে এগোনো যায়। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবন অনুধ্যান করলে আমরা সেই শুদ্ধতার স্পর্শ পাই। জীবনের মধ্যে দিয়ে আদর্শকে ফুটিয়ে তুলে বহু জীবনকে শান্তির পথ দেখানোর যে প্রচেষ্টা তাঁরা করেছেন আমাদের প্রতি বছরে নতুন করে শুরু করার অনুপ্রেরণামন্ত্র ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনদর্শন থেকে অহরহ অনুভব করতে হবে।

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহহীন হয়ে, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে, ঋষিমুনি দ্বারা স্বীকৃত সারস্বত শিক্ষাকে অস্বীকার করে সম্পদ বৃদ্ধির সাধনায় আত্মতৃপ্তি অনুভবের মধ্যে দিয়ে আমরা যে যাত্রাপথ রচনা করেছি সেই যাত্রাপথ সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের দরজাও খুলে দিয়েছে। ঠাকুরের বাণী আমাদের মুখস্থ হয়েছে কিন্তু আত্মস্থ হয়নি, তাই অহংকার আমাদের পিছু নিয়েছে। সন্ন্যাসীর মন নিয়ে সংসার করার যে শিক্ষা ঠাকুর দিয়েছিলেন সেই শিক্ষার থেকে সরে এসে সংসারের মধ্যে সংসারের শেষ দেখতে চাইছি আমরা, ফলে সংসারই আমাদের কাছে অশেষ হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর কোনো জাতিকে উন্নত হতে গেলে তার অতীত সম্পর্কে গৌরববোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল আমাদের শিক্ষিত সমাজ সনাতন শিক্ষাবর্জিত হয়ে অধীশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে এক অদ্ভুত উদাসীনতা তাদের গ্রাস করেছে। পশ্চিমের ভোগবাদ ও ধনতান্ত্রিক চিন্তায়

ফ ঃ ৫

আবিষ্ট হয়ে সত্য ও সনাতনকে অস্বীকার করার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইউরোপের চিন্তার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতি। আমাদের চিরকালই ভরকেন্দ্রে থেকেছে ধর্ম ও সমাজ। ইউরোপ অর্থশক্তির জোরে সত্যযুগকে অস্বীকার করতে চাইছে। ভারতবর্ষের কোনোকালে যেন সেই দুর্মতি না হয়। সনাতন ধর্ম আমাদের ধারণ করে রেখেছে। বিবেকানন্দ বলেছেন আধুনিক সংস্কারকরা প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করে সংস্কারের আর কোনো উপায় দেখতে পান না। তারা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিফল হয়েছেন— এর কারণ কী?

কারণ, তাঁদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই তাদের নিজেদের ধর্ম ভালোভাবে পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের একজনও সকল ধর্মের প্রসূতিকে (বৈদিক ধর্ম) বোঝবার জন্য যে ধর্ম সাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়ে যাননি।

ভগবানকে পরিত্যাগ করে, নিরীশ্বরবাদকে ভরসা করে ভারতবর্ষে যাঁরাই এগোতে চেয়েছেন তাঁরা সফল হননি। এদেশে চার্বাক দর্শন থাকলেও তা কোনোদিনই ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষের হৃদ্‌মন্দিরে স্থান পায়নি। ভারতবর্ষ চিরকালই থেকেছে সত্য ও সনাতনের সঙ্গে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, গো, গায়ত্রী, গঙ্গা, গুরু ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলকে আপ্লুত করে রেখেছিল, আছে ও থাকবে।

ধর্ম সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের করালগ্রাস এই সত্যকে নির্বাপিত করতে পারেনি। নববর্ষে পুণ্যতিথিতে আমাদের উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী হতে গেলে বেদান্ত দর্শনকে ও উপনিষদের ভাবকে অনুধাবন করতে হবে। যোগচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থকে উপলব্ধি করতে হবে। একটি জাতি যখন আত্মসংস্কারের প্রকৃত ধারাকে উপলব্ধি করতে পারে তখন সে তার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তৎপরবর্তী সমসাময়িক কালকে বোঝার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়। কোনো জাতির আর্থিক দারিদ্র্য কিছুকালের জন্য তার অবনমনের সূচনা করে। আর ধর্ম সাংস্কৃতিক দীনতা তার সামগ্রিক পতনকে তরান্বিত করে।

ব্রিটিশ শাসনকালে আমাদের উচ্চবিত্ত উচ্চশিক্ষিত হিন্দু সমাজভুক্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকুল স্বাধীনোত্তরকালে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ধর্ম ও সনাতন ভাবধারাকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে এগোতে চেয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে এ প্রচেষ্টা শুরু হলেও সনাতন ধর্মের পক্ষে প্রবল জনসমর্থন থাকার ফলে ও স্বনামধন্য লেখকদের অধিকাংশই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য নিরীশ্বরবাদী শক্তি স্বাধীনতার পূর্বে সেরূপ প্রাধান্য অর্জন করতে পারেনি যা তারা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এক দীর্ঘ সময়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং সমর্থনে সনাতন ধর্মের প্রতি অভক্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে।

নববর্ষে আমরা জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি এবং সাধনসিদ্ধ সংস্কারের দ্বারা আত্ম-উদ্বোধনে ব্রতী হবো। এই আশাই সত্য হোক। মানবদেহের সর্বোত্তম সত্তা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির যে পথ ঠাকুর, মা, স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন সেই আদর্শই আমাদের জাতিগঠনের সর্বোত্তম পাথেয়। জগতের কলহপ্রধান পরিবেশের মূলে রয়েছে স্বার্থবুদ্ধি, অর্থবুদ্ধি ও দেহবুদ্ধি। সেখান থেকে চিত্তকে মুক্ত করে চৈতন্যকে স্থিত রেখে ব্রহ্মবুদ্ধি, পরমার্থ চিন্তা ও দেব বুদ্ধি জাগরিত করতে হলে সরলতার মধ্যে দিয়েই তা সম্ভব। বর্তমানকালে কুটিল মানসিকতার প্রবল প্রকাশের ফলে সরল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনযাপনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে— এ হলো কলির প্রকৃতি, যেখানে কলহ ও কুটিলতা স্বচ্ছতা ও সরলতাকে কটূক্তি ও কুবাক্যে জর্জরিত করার সুযোগ ও সাহস পায়।

ঠাকুরের দর্শন মানতে হলে এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, লোকধর্মকে আশ্রয় করে, সনাতন ধর্মের প্রতি ভক্তি রেখে, যুক্তিকে গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করতে হবে। কলিতে শক্তিহীন হলে অনাচারীরা অন্যায়ভাবে আঘাত করার সুযোগ পাবে। তাই অন্তরের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে, আমাদের মহাপুরুষের মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে হবে এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে দিয়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দ্বন্দ্ব থেকে দ্বন্দ্বাতীত স্তরে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে প্রচেষ্টা নিতে হবে। ঠাকুরের ভাবশক্তির গতিরূপ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্থিতিরূপ হলেন সঙ্ঘজননী মা সারদা। স্বামীজীর রামকৃষ্ণলোকে গমনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববীজকে শ্রীশ্রী মা পল্লবিত হতে ও জগৎ সংসারে গ্রহণীয় হয়ে ওঠার পথে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন।

পুরাতন বছরকে ছেড়ে আসার পথে এই সাধনা থেকে শিখে আসতে হবে— সংসারের মধ্যেই সংসারের শেষ নেই। একথা বুঝেই সংসারকে অবলম্বন করে বাঁচার ক্ষুদ্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। বৃহৎ সংসারের ভাববলয়ে ক্ষুদ্র সংসারের স্বার্থান্ধতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্তরের মধ্যে অন্তরাত্মাকে স্থাপন করতে হবে ধর্মের পথে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করে ধর্ম তত্ত্বকে মূলে রেখে এগোতে হবে। সনাতন ধর্মভাব সকলের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনের অনুভব জাগ্রত করে, অন্তরকে পরিশুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে বাইরের গতির সঙ্গে অন্তরের স্থিতির মেলবন্ধনকে সার্থক করতে শেখায়। এ সাধনা সত্য হলে তবেই আমরা নববর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে উপলব্ধি করে এগোতে পারবো আত্মনিবেদনের পথে ভারত সাধনার ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে। তবেই অধ্যাত্মবোধকে ভারত সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে নববর্ষকে আহ্বান করতে পারব। তখনই অন্তরের উপলব্ধি আমাদের চৈতন্য জাগরণের পথকে ত্বরান্বিত করবে। □

উনিশ শতকের বাঙ্গলায় নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা

অভিমন্যু গুহ

বাঙ্গলার নবজাগরণের সূচনাকারী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। উনিশ শতকে বাঙ্গলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁ আদৌ হয়েছিল কিনা বা তা হলেও সেটা ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় বা নির্দিষ্ট করে বললে এথেন্সের রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনীয় কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক বহুদিনের। মূলত বামপন্থী ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে যুক্তি হলো, এথেন্সের রেনেসাঁর সঙ্গে বাঙ্গলার নবজাগরণ তুলনীয় নয়, কারণ সেখানে নবজাগরণে প্রতিটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন, এখানে অংশ নিয়েছিলেন মূলত হিন্দু বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত সমাজ। মুসলমান সমাজের বঙ্গীয় নবজাগরণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কই? এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাঙ্গালি হিন্দু সমাজে উনিশ শতক জুড়ে একের পর এক সমাজসংস্কারক এসেছেন, যে স্বাভাবিক ঔদার্যে হিন্দু সমাজ তাঁদের গ্রহণ করে নবজাগরণে জারিত হতে পেরেছে, সেই স্বাভাবিক ঔদার্য এখানকার মুসলমান সমাজের ছিল না। সুতরাং কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ ছিল না বলে বাঙ্গলার নবজাগরণ হয়নি, বামপন্থী ঐতিহাসিকদের এই যুক্তি ধোপে টেঁকে না।

যাইহোক, বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের এই যে নবজাগরণ, তার পেছনে ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক অবদান ছিল। নবজাগরণের সূচনাকারী হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলার পেছনেও স্বদেশপ্রেমের একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল। এমনকী তিনি নিজেকে 'একেশ্বরবাদী হিন্দু' বলেও সমকালে নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আগে তিনি কিছুকাল ইউরোপীয়দের একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠান ইউনিটারিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু এখানকার বিদেশীয় ভাবের প্রার্থনাপ্রণালী কোনোভাবেই তাঁকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দিতে পারছিল না। তিনি তাঁর দুই সহকর্মী তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বদেশীয় সনাতন প্রণালীতে প্রার্থনাপদ্ধতি প্রচলনের নিমিত্ত ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু 'একেশ্বরবাদী

TATA MOTORS
Connecting Aspirations
TATA
NEW
FOREVER
A Whole New World of Powerful
& Advanced Cars from tata motors
HARRIER
with Automatic Transmission
and Panoramic Sunroof
TIAGO
New Powerful
BS6 Engines with AMT
NEXON
with Electric Sunroof
TIGOR
New Powerful
BS6 Engines with AMT
ALTROZ
India's Safest Hatchback
WORLD CLASS SAFETY & QUALITY
INDIAN MADE
GLOBAL NCAP
★★★★★ 5-STAR SAFETY RATING
*HIGHEST SAFETY RATING FOR AOP
For Test Drive Contact - K B Motors Pvt Ltd, 2/3
Judges Court Road, Kolkata-700027
Email - seleshead.alipore@kbmotors.in
KB MOTORS : 8336966060

হিন্দুসমাজ' নামেই পরিচিত ছিল।

রামমোহনের পরবর্তীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে সুসংগঠিত করবার কাজে মনোনিবেশ করেন। তখন ডিরোজিও প্রয়াত হলেও তাঁর ইয়ংবেঙ্গল দলের সামাজিক দাপট কিন্তু প্রচণ্ড। দেবেন্দ্রনাথও প্রথমে ডিরোজিওর অনুগামী ছিলেন পরে তিনি রামমোহন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে ব্রাহ্ম হলে ডিরোজিয়ানদের সংস্রব ত্যাগ করেন। এবং হিন্দুসমাজকে খ্রিস্টিয়ানির প্রভাবমুক্ত করতে আজীবন সংগ্রাম করেন। উনিশ শতকের সেই মধ্যপর্বে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে তিনি খ্রিস্টান পাদরিদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে, ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে লড়াই না করলে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার কাজটা কঠিন হতো সন্দেহ নেই। এর পাশাপাশি সমাজে হিন্দুত্বের জাগরণেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর সময়ে ব্রাহ্মসমাজ 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' নামে পরিচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, যিনি সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের মাতামহ হতেন। তিনি সারাজীবন জাতীয়তার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য জাতীয়তার পিতামহ আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

যাইহোক, এই জাতীয়তার সাধনায় তিনি হিন্দুধর্মকেই পাথেয় করেছিলেন। সমকালীন হিন্দুধর্ম সাহিত্যে তিনি সে বিষয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'বুদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রভৃতি একের পর এক কালজয়ী গ্রন্থে তিনি হিন্দুধর্মের জয়গান গেয়েছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় একথাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ব্রাহ্মধর্ম আসলে হিন্দুধর্মেরই বিশুদ্ধ রূপ ও 'প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম হলো হিন্দুধর্ম'। কারণ একেশ্বরবাদের সাধনা হিন্দুধর্মে আগাগোড়াই বর্তমান ছিল। মূলত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ, যা প্রথমে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ নামে সুপরিচিত ছিল, পরে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ভাঙনের পর আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে; ব্রাহ্মসমাজের এই অংশ প্রথমাবধি মনে করতো, ব্রাহ্মসমাজ আসলে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের

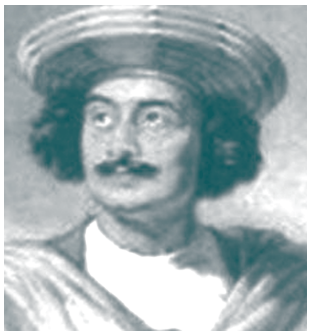
রামমোহন রায়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনারায়ণ বসু

কেশব চন্দ্র সেন

সভাপতি হিসেবে রাজনারায়ণ বসু একবার দেবেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ব্রাহ্মধর্মে আর হিন্দুধর্মে প্রভেদ কোথায়?' তাতে দেবেন্দ্রনাথ অসামান্য একটা উত্তর দিয়েছিলেন, 'কিছুমাত্র প্রভেদ নাই. কেবল পরিমিত ঈশ্বরের স্থলে অপরিমিত ঈশ্বর বসাতে হবে'। অর্থাৎ সনাতন হিন্দুধর্ম ও নব্য ব্রাহ্মধর্ম অভেদ, কিন্তু এদের উপাসনা পদ্ধতির তারতম্যের কথাই বলতে চেয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। যেহেতু ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদের উপাসক, তাই 'অপরিমিত ঈশ্বরের' কথা বলেছেন তিনি।

মূলত এই মানসিকতা থেকেই দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ন্যাশনাল পেপারের সূত্রপাত। ন্যাশনাল পেপারে রাজনারায়ণ বসুর সুদূর মেদিনীপুরের বুকে সূত্রপাত হওয়া জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভার প্রস্তাব এই সাপ্তাহিক পত্রে মুদ্রিত হয়, যা কালক্রমে 'হিন্দুমেলা'র সুচনা করে। দেবেন্দ্রনাথের পুরো পরিবার দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে হিন্দুমেলা নামাঙ্কিত মেলাটির সংগঠনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া হিন্দুমেলার মূল মস্তিষ্ক নবগোপাল মিত্র, মেলার প্রেরণা রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ তো ছিলেনই। তাঁরাও কিন্তু ব্রাহ্ম এবং রাজনারায়ণ তো স্বয়ং আদি ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে আদি ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পে সংগঠন হিসেবে আজীবন কাজ করে গেছে।

বাকি দুই ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ও সধারণ ব্রাহ্মসমাজও কোনও না কোনওভাবে হিন্দুত্বের জাগরণে কাজ করে গিয়েছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেব ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রেততত্ত্ব বা থিয়োজফি চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস থেকে থিয়োজফি চর্চার উদ্ভব। গীতার দর্শনের মধ্যেই আত্মার অবিনশ্বরতার তত্ত্ব নিহিত আছে।

রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে কেশব সেনের অনুগামী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের চর্চায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন করে। এতটাই যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁদের প্রার্থনায় মায়ের নামগান, কীর্তন ইত্যাদি যুক্ত হয়। এই ভাবেই ব্রাহ্মসমাজ উনিশ শতকে হিন্দু বাঙ্গালির নবজাগরণ পর্বে হিন্দুধর্মের জাগরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। □

যক্ষের শিক্ষা

বোধিসত্ত একবার বারাণসীতে এক অত্যন্ত গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন সুতনু। কষ্টের মধ্যে দিয়ে সুতনু বড়ো হতে থাকেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতা কোনো কাজ করতে পারেন না। তাঁকেই দিনমজুরের কাজ করে পিতা-মাতার ও নিজের দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে হয়।

সুতনুর পিতার হঠাৎ একদিন মৃত্যু ঘটল। এদিকে বারাণসীর রাজা একদিন প্রচুর লোকজন নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। রাজা দেখলেন একটি হরিণ ছুটে যাচ্ছে। রাজা হরিণকে তাক করে তির ছুড়লেন। হরিণটি ছিল খুব চালাক। সে এমনভাবে ছিটকে পড়ল যেন তিরবিদ্ধ হয়েছে। রাজা হরিণটিকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে গেলেন। কিন্তু কাছে আসতেই হরিণটি গেল পালিয়ে। রাজা খুব রেগে গেলেন। তৎক্ষণাৎ হরিণের পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে ধরে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তরবারির কোপে দু'টুকরো করে ফেললেন। তারপর লাঠির দু'পাশে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে চললেন। বহুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে রাজা একসময় খুব ক্লান্ত হয়ে একটি বটগাছের নীচে শুয়ে পড়লেন।

বটগাছটিতে বাস করত এক যক্ষ। বহু বছর ধরে তপস্যায় সে বর লাভ করেছিল যে, ওই বটগাছের নীচে যে আসবে তাকে খাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। রাজা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একটা বিকট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। অট্টহাস্য করে যক্ষ বলল, আমি এই গাছে বাস করি। আজ রাতে তুমিই হবে আমার খাবার। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি তো অন্যায় করিনি, তুমি কেন আমাকে খেতে চাও? যক্ষ বলল, আমি ওসব জানি না। আমার গাছের ছায়ায় যে আসবে সে-ই হবে আমার ভক্ষ্য। রাজা মনে মনে খুব ভয় পেলেও মুখে সাহস এনে বললেন, আমি না হয় আজ তোমার আহার হলাম, কাল খাবে কী?

রাজা যক্ষকে বললেন, আমি বারাণসীর রাজা। তুমি আজ দু'টুকরো হরিণের মাংস খাও, কাল থেকে তোমার জন্য অন্য খাবারের ব্যবস্থা করব। যক্ষ রাজার কথায় বিশ্বাস করে বলল, আজ আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম, আমার খাবার না পাঠালে তোমার নিস্তার নেই। রাজা তখনকার মতো প্রাণ নিয়ে পালালেন। রাজ্যে ফিরে চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে বাঁচানো যায় রাজ্যের লোকেদের। মন্ত্রীকে এই সমস্যার কথা বলতেই মন্ত্রী বললেন কোনো চিন্তা করবেন না মহারাজ। কয়েদখানা থেকে রোজ একটা করে কয়েদি পাঠানো হবে যক্ষের কাছে।

প্রতিদিন যক্ষের কাছে কয়েদি পাঠতে পাঠাতে কয়েদখানা খালি হয়ে গেল। রাজা পড়লেন মহা সমস্যায়। আবার মন্ত্রী বললেন, রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হবে, যে যক্ষের কাছে খাবার নিয়ে যাবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করা হবে। সেইমতো ট্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হলো। ঘোষণা শুনে সুতনু মনে করলেন তিনি যাবেন যক্ষের খাবার নিয়ে। আর তার ফলে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা পেলে তাঁদের আর কোনো অভাব থাকবে না।

সেইমতো সুতনু রাজ দরবারে পৌঁছে গেলেন। রাজাকে যক্ষের কাছে খাবার নিয়ে যাবার কথা বলতেই রাজা খুশি হয়ে বললেন তোমার কী কী চাই। সুতনু বললেন, মহারাজ, আমার একজোড়া খড়ম, একটি ছাতা আর যক্ষের খাবার চাই।। রাজা সবকিছুই দিলেন সুতনুকে। সেসব নিয়ে সুতনু পৌঁছে গেলেন যক্ষের কাছে। যক্ষ বলে উঠল, ওহ্, তাহলে তুমিই আজ আমার প্রধান আহার? সুতনু বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে বললেন, আমি তোমার গাছের ছায়ায় নেই, আর তোমার মাটিতেও দাঁড়িয়ে নেই। এই অবস্থায় তুমি আমাকে খেলে ধর্মভ্রষ্ট হবে আর বৈশ্রবর্ণের দেওয়া বরও নষ্ট হয়ে যাবে।

সুতনুর কথা শুনে ভয় পেয়ে যক্ষ বলল, ঠিক আছে, তুমি খাবার রেখে চলে যাও। সুতনু বুঝল যক্ষ জব্দ হয়েছে। তিনি যক্ষকে বললেন, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। আমার সঙ্গে রাজার কাছে চলো তুমি। তোমার প্রতিদিনের খাবার জোগানোর ভার গ্রহণ করলাম আমি। বেশ খুশি হয়ে যক্ষ চলল সুতনুর সঙ্গে। রাজা সব খবর জেনে খুশি হয়ে যক্ষের জন্য ব্যবস্থা করলেন নিরামিষ খাবারের। তারপর রাজা সুতনুকে বারাণসীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। যক্ষও উচিত শিক্ষা পেয়ে নিরামিষ খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

বাদল (সুধীর) গুপ্ত

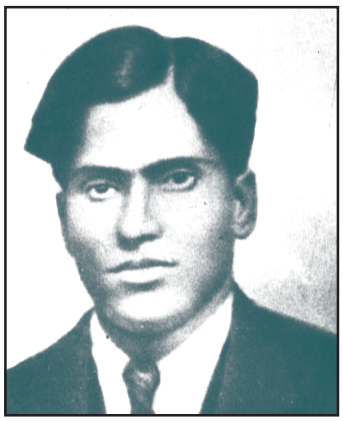

বিপ্লবী বাদল গুপ্তের জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকায় জন্ম। বাবার নাম অবনীনাথ গুপ্ত। গুপ্ত বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য হিসেবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তিনি, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কারা বিভাগের অধিকর্তা সিম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। তাঁদের গুলি চালনার ফলে আইজি কর্নেল সিম্পসন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আহত হন। তারপরেই পুলিশবাহিনীর সঙ্গে উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় হয়। বিপ্লবীত্রয়ের গুলি শেষ হয়ে গেলে তাঁরা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে পটাশিয়াম সায়নাইড খান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কী?

- নদীয়ার পলাশী যুদ্ধই ভারতে প্রথম ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করেছিল।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার নবদ্বীপে।
- রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ শহরের প্রতিষ্ঠাতা।
- বাংলাভাষায় রামায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্ম নদীয়া জেলার শান্তিপুরে।
- বিখ্যাত ইসকন মন্দির নদীয়া জেলার মায়াপুরে অবস্থিত।
- নদীয়া জেলার মধ্যে দিয়ে জলঙ্গী ও চূর্ণী নদী প্রবাহিত হয়েছে।

ভালো কথা

ভারতীয় সংস্কৃতি

খুব ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঠাকুমা সকালে স্নান সেরে বাড়ির পেছনে গাছতলায় গিয়ে কলাপাতায় যবের ছাতু মেখে পাঁচ জায়গায় রেখে দেন। আমি সেবার জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, চৈত্র সংক্রান্তিকে ছাতু সংক্রান্তি বলে। এদিন বাড়ির সবাইকে ছাতু খেতে হয়। আর বললেন শুধু নিজেরা খেলে হবে না, পাখি, পিঁপড়ে, কুকুর, শেয়াল ও গোরুকেও দিতে হয়। পাখি ও পিঁপড়ের জন্য সারা বোশেখ মাস জল রাখতে হয়। আমি স্কুলের বন্ধুদের বলতেই তারা বলল তাদের বাড়িতেও এরকম হয়। আমাদের কথা শুনে ম্যাম বললেন এর নাম ভারতীয় সংস্কৃতি। সমস্ত প্রাণীর জন্য চিন্তা করতে হয়।

স্নেহা রায়, একাদশশ্রেণী, মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বছরের শেষে

শুভম মহান্তি, একাদশ শ্রেণী, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

বছরের শেষে এসে
করতে বসি হিসাবনিকাশ
কী পেলাম আর কী পেলাম না
আরও যত ছিল অভিলাষ।
দুঃখের দিনগুলি ভুলে যাও বন্ধু
যতকিছু কটু কটু কথা
মিঠি মিঠি ক্ষণ থাকে যেন মনে
শুধু ঝরে যাক যত ব্যথাবেদনা।

বছরের শেষে চড়কে গাজনে মেতে
ভুলে যাও কালো কালো স্মৃতি
নতুন বছরে নতুন আলোয়
সব কালোর হয়ে যাক ইতি।
কোনোদিন যদি নিজেরই অজান্তে
পেয়ে থাকো কোনো ব্যথা
বছরের শেষদিনে ভুলে যাও বন্ধু
যতসব দুঃখদিনের কথা।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শরবতে চিনির বদলে আখের গুড় ব্যবহার করুন

সুতপা বসাক ভড়

গ্রীষ্মকাল এসে গেল। এই ঋতুটি আমাদের দেশে খুবই প্রখর। তীব্র গরমে অস্বস্তিবোধ করি, অথচ প্রকৃতিতে প্রত্যেক ঋতুর প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সেজন্য গ্রীষ্মকেও আমরা বছরের প্রারম্ভেই (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) বরণ করে নিই। এই সময় অসহ্য গরমের হাত থেকে বাঁচার উপায়ও প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে গ্রীষ্মকালে বেশ কিছু পানীয় বাড়িতেই মেয়েরা তৈরি করে আসছেন; যা আমাদের শরীর-মন উভয়ের জন্য অতি উপকারী। যেমন— আমাদের বাড়িতে তৈরি পাতিলেবুর শরবত, দইয়ের ঘোল, বেলের শরবত, মিছরির শরবত, আমপানা, ডাবের জল ইত্যাদি।

ওই শরবতগুলিতে বেশ কয়েকবছর আগে পর্যন্ত গুড়-মিছরি এবং বিটনুন ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে আমরা বাড়িতে যথেচ্ছ ভাবে চিনি এবং বিজ্ঞাপনের সাদা নুন দিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় বানিয়ে থাকি। আমরা মহিলারা যেহেতু রান্নাঘরের মূল দায়িত্বে থাকি, সেজন্য চিনির পরিবর্তে গুড় অথবা মিছরি এবং সাদা নুনের পরিবর্তে বিটনুন ব্যবহার করার চেষ্টা করব; কারণ স্বাস্থ্যের জন্য চিনি বিষবৎ, অথচ গুড় ও মিছরি অতি উপকারী।

প্রথমে আসি পাতিলেবুর শরবত প্রসঙ্গে। আমরা সবাই বাড়িতে বানাই, তবু একটু ব্যতিক্রম, অথচ উপকারী শরবত বানাতে হলে সবুজ রঙের পাতিলেবু আধঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার এক গ্লাসের জন্য এক চামচ আখের গুড়, এক চিমটি বিটনুন আর অর্ধেক লেবুর রস ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে পান করলে তা খুবই উপাদেয় হবে।

আমরা সবাই বাড়িতে দইয়ের ঘোল বানিয়ে থাকি। খুবই ঘরোয়া এই পানীয়টির জন্য বাড়িতে এক কাপ টক দই, এক চামচ আখের গুড়, এক চিমটি বিটনুন, সামান্য জিরে গুঁড়ো একসঙ্গে চামচ দিয়ে ফেটিয়ে মসৃণ করে নিতে হবে। এরপর সমপরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে নিলেই তৈরি 'ঘোল'।

পাকা বেলের সরবত বানাবার জন্য প্রথমে পাকা বেলটি ভেঙে ভেতরের অংশটি খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখব। তারপর সেটি জলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে সামান্য বিটনুন আর পরিমাণ মতো ঠাণ্ডা জল মেশালেই তৈরি পাকা বেলের শরবত। গ্রীষ্মের তাপের থেকে মুক্তি পাবার প্রাকৃতিক ওষুধ।

মিছরির শরবত খুবই সাধারণ। পেটের জন্যও উপকারী। জলে মিছরি ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে নিলেই তৈরি মিছরির শরবত।

আমপানা বা কাঁচা আমের শরবতে কাঁচা আম খোসা শুদ্ধ একটু সেদ্ধ করে ভেতরের অংশটা বের করে চটকে, ছেঁকে নিয়ে তাতে স্বাদমতো আখের গুড় বিটনুন মিশিয়ে গ্লাসে নিয়ে পরিমাণ মতো ঠাণ্ডা জল মেশালেই তৈরি কাঁচা আমের পানা।

এরপর ডাবের জল-প্রাকৃতিক পানীয়। দাম একটু বেশি, সেজন্য সাধারণ ঘরে মাঝেমধ্যে খাওয়ার চলন আছে। উপরোক্ত পানীয়গুলি অতি সাধারণ এবং আমাদের ঘরে ঘরে এর প্রচলন আছে। শুধু এগুলিতে যে সামগ্রী দুটি অতি ব্যবহৃত হয়— চিনি বা সাদা নুন— এই দুটি আমরা ব্যবহার না করার চেষ্টা করব— কারণ এগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক। গুড়, মিছরি, বিটনুন--- এগুলি তুলনামূলক ভাবে প্রাকৃতিক। 'শক্কর' নামক একরকম গুড় জাতীয় জিনিস উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, যা আখের গুড় থেকে তৈরি ও প্রাকৃতিক গুণাবলীতে ভরপুর। চিনির পরিবর্তে এটিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের নিজস্ব পানীয়ের সম্ভার অনেক বড়ো। সেগুলি শরীরের জন্য উপকারী ও সুস্বাদু। বাজারে প্লাস্টিকের বোতলের অথবা প্যাকেটের পানীয়গুলি অনাবশ্যক শক্তিতে ভর্তি, ক্যাফিন যুক্ত, অত্যধিক চিনি যুক্ত। এগুলির কৃত্রিম রং, স্বাদ, গন্ধে আমরা সাময়িকভাবে মুগ্ধ হলেও এর ব্যবহার নীরবে একটি জাতির ক্ষতি সাধন করে চলেছে। নতুন প্রজন্ম এইসকল পানীয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আমরা মহিলারা যদি নিজেদের রান্নাঘরেই আমাদের প্রচলিত পানীয়গুলির ব্যবস্থা রাখি, তাহলে ওই বিদেশি কোম্পানিগুলো আমাদের পরিবারের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। ওইসব দামী বোতলবন্ধ পানীয়গুলো তারা নিজেদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিক্রি হতে দেয় না, অথচ আমাদের দেশে দিব্যি বিক্রি করে। সচেতন হবার সময় এসেছে। নিজেদের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা মহিলারা সচেতন হবো। এতে অর্থের অপচয় বন্ধ হবে, পরম্পরা বজায় থাকবে এবং সকলের স্বাস্থ্যও সুন্দর রইল। আসুন, আমরা সবই একটু সচেতন হই। □

পাঁচ লক্ষের মুক্তি হলো, অপেক্ষমান দেড় কোটি

বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উৎখাত করার কাহিনি নিয়ে তৈরি বিবেকরঞ্জন অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' চলচ্চিত্রটি বহুল চর্চিত। চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে একটা 'সেনসেশন' তৈরি হয়েছে। চলচ্চিত্রটির মুখ্য চরিত্র চিত্রায়নে আছেন অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য থেকে অনেক দূরে, এই পশ্চিমবঙ্গেও চলচ্চিত্রটিকে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগ তৈরি হয়েছে; সে আবেগে এমনকী 'নবীনা' সিনেমা হল থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে টিপু সুলতান মসজিদ পাড়ার গুন্ডাদেরও। সিনেমাটির প্রতি মানুষের আবেগে গুন্ডারা পিছিয়ে যেতেও বাধ্য হয়েছে। সিনেমাটি হিন্দু পণ্ডিতদের উপর কাশ্মীরি জেহাদিদের চরম অত্যাচার, তাঁদের স্বভূমি থেকে উৎখাত হবার কাহিনি অবলম্বনে চিত্রায়িত। সিনেমাটি আজ মানুষের মুখে মুখে।

চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। যে কাশ্মীরি নেতারা কাশ্মীরি হিন্দু অত্যাচারিত ও উৎপাটিত হওয়া প্রসঙ্গে মুখে সর্বদাই কুলুপ এঁটে থাকত তাঁরাও এখন প্রতিক্রিয়া দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচার নিয়ে সিনেমা এই প্রথম হলেও এর আগে অনেকেই এই বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের দুটো টার্ম রাজ্যপাল থাকা আইসিএস অফিসার জগমোহন তাঁর My frozen turbulence in Kashmir নামে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক লিখেছেন ১৯৯১ সালে। বইটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তিনি ওই তীব্র সংকটময় সময়ে, কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের উদ্বাসনের একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন 'ত্রস্ত কবুতর ও পরিত্যক্ত সম্প্রদায় কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা' নামের এক পরিচ্ছেদে। জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা ও তাঁর সরকারের দেওয়া তথ্যাবলীকে জগমোহন বলেছেন 'বিকৃত

একটা নোয়াখালি ফাইলস, একটা ভৈরব ব্রিজ ফাইলস, একটা কালশিরা ফাইলস অথবা ১৯৪৬-এর কলকাতার উপর একটা কলকাতা ফাইলস কি নির্মিত হতে পারে না! কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি; কিন্তু বিতাড়িত হিন্দু বাঙ্গালির সংখ্যা দেড় কোটির উপরে— এটাও স্মর্তব্য।

ফঃ ৬

ও মিথ্যা তথ্যের প্লাবন।' তথ্যবহুল ওই গ্রন্থের বিবরণ একটা প্রবন্ধের পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু ইঙ্গিতটুকু দেওয়া গেল। ওই একই বিষয়ের উপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক লিখেছেন সাংবাদিক রাহুল পণ্ডিতা। বইটির নাম Our Moon has Blood Clots ; বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে। তিনি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এই উৎখাত হওয়াকে চিহ্নিত করেছেন, 'The Exodus of the Kashmiri Pandits' হিসেবে। রাহুল নিজেও কাশ্মীরি পণ্ডিত বংশজ এবং পিতা-মাতার সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে উৎখাত হয়েছিলেন সেই ১৯৯০ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্রই চোদ্দ। সাংবাদিক রাহুল পণ্ডিতাও তাঁর পুস্তকে কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু পণ্ডিত গণহত্যার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, উপত্যকায় হিন্দু পণ্ডিত গণহত্যা শুরু হয়েছিল কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৮৯-১৪১৩) সময় থেকে। এই সিকান্দার 'প্রতিমা ভঙ্গকারী, কালাপাহাড় সিকান্দার' হিসেবে পরিচিত ছিল। স্থানীয় হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল বাতিকগ্রস্ত, উন্মাদের মতো। সে পরিচিত ছিল হিন্দুদের মন্দির ভঙ্গকারী এবং বিভিন্ন 'কর' বসানোর কারিগর হিসেবে। ফলে হিন্দুদের এলাকায় তার কোনো ভ্রমণ থাকলেই সেখানকার হিন্দুরা ভয়ে কাঁপত। সিকান্দার কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দির ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। এমনকী হিন্দুদের ধর্মাচরণও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সে। হিন্দুদের তিলককাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এসব কারণে তাকে 'বুতশিকন' বা মন্দির ধ্বংসকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সে ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী মালিক সইফুদ্দিনের নেতৃত্বে মন্ত্রীরা কোথাও কোনো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থাকলে ধ্বংস করে দিত। এই প্রধানমন্ত্রীর মূল নাম ছিল সুহভট্ট। হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে সে সইফুদ্দিন হয়। সিকান্দার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সে এতজন কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতকে হত্যা করেছিল যে, ওই হিন্দু পণ্ডিতদের পরিহিত উপবিতের ওজন ছিল সাত মণ। এই সিকান্দারের রাজত্বকালেই হতভাগ্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মুসলমান তরবারির হাত থেকে বাঁচতে গোঙানি শোনা যেত— না ভট্ট অহম, না ভট্ট অহম।' অর্থাৎ আমরা পণ্ডিত নই। তার সময় থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান আধিপত্য বেড়ে যায়। সিকান্দারের পরে তাঁর ছেলে আলি শাহ্ সুলতান হয়। সেও তার পিতার মতোই চরম হিন্দু নিপীড়ক ছিল। জনশ্রুতি এই যে, এই সময়ে উপত্যকায় মাত্র এগারটি কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত পরিবার অবশিষ্ট ছিল। বাকিরা হয় পালিয়েছিল অথবা মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তার পরে ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে তার ভাই জয়নাল আবেদিন সুলতান হয়। জয়নাল তুলনায় সহিষ্ণু ও প্রজাপালক সুলতান ছিল। তাঁর সময়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা তুলনায় স্বস্তিতে বাস করতে পেরেছিল।

১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাশ্মীরে মুঘল রাজত্ব শুরু হয়। মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গির কয়েকবার কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময়ে আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচারের বিভীষিকা নেমে আসে। এই সময়ে কাশ্মীরের মুঘল সুবেদার ইফতিকার খাঁর (১৬৭১-১৬৭৫) রাজত্বকালে নৃশংস অত্যাচার নেমে আসে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর। ইফতিকারের চরম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কাশ্মীরি হিন্দুরা নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে আবেদন জানান তাঁদের এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি কাশ্মীরি হিন্দুদের ফিরে গিয়ে সুবেদারকে আবেদন করতে বলেন যে, ইফতিকার যদি গুরু তেগ বাহাদুরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে সফল হয় তাহলে সমস্ত কাশ্মীরি পণ্ডিত ইসলাম মেনে নেবে। কিন্তু গুরু তেগবাহাদুর 'শির দিয়া, পর সর নহী দিয়া'; ফলে কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতেরা এ যাত্রায় বেঁচে যান। কিন্তু এর পরে কাশ্মীরের শাসনক্ষমতায় আসে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী আফগান শাসকেরা। তারা সাত দশক কাশ্মীরে রাজত্ব করে। কাশ্মীরে আফগান সুবেদার আসাদ খাঁ সম্পর্কে Walter R.Lawrence তাঁর The Valley of Kashmir গ্রন্থে লিখেছেন, 'It was his practice to tie up the Pandits, two and two, in grass sacks and sink them in the Dal Lake. As an amusement, a pitcher filled with ordure would be placed on a Pandit's head and Musalmans would pelt the pitcher with stones till it broke, the unfortunate Hindu being blinded with filth। লরেন্সের এই বর্ণনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর উদ্ভাবিত সেই 'বৈকুণ্ঠবাস' করানোর কাহিনি। লরেন্স আরও লিখেছেন, আটা মুহাম্মদ খানের সুবেদারির সময়ে কাশ্মীরে কোনো হিন্দু পণ্ডিতকে দেখলেই মুসলমানরা লাফিয়ে তার ঘাড়ে উঠত এবং পণ্ডিতের ঘাড়ে চড়েই অন্যত্র যেত। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার তাই নতুন নয়, এটা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। আধুনিক যুগে হিন্দু পণ্ডিত উদ্বাসনের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর ডোগরা রাজাদের শাসনাধীনে আসার পরে। আর তাদের এই পদ্ধতিটা কাশ্মীর, বাঙ্গলা সর্বত্র একই। বহিরাগত মুসলমানেরা এদেশ দখলের পর থেকেই এই প্রক্রিয়া চলেছে। কোনো হিন্দু রাজা হলেই তাঁকে মুসলমানেরা সহ্য করতে পারে না। সে কাশ্মীরে ডোগরা রাজারা হোক, বা বাঙ্গলায় রাজা গণেশ, সীতারাম রায় বা মহারাজা প্রতাপাদিত্যই হোন। অথচ, প্রকৃপক্ষে দেশটা হিন্দুদেরই। যদিও কাশ্মীরে ছুটছাঁট ঝামেলা সত্ত্বেও কাশ্মীরিদের মধ্যে প্রচলিত 'কাশ্মীরিয়ত' অক্ষুণ্ণ ছিল মোটের উপর। ১৯৮৪ সালে শেখ আবদুল্লার জামাই জিএম শাহ মুখ্যমন্ত্রী হলে অবস্থাটা বিগড়ে যায়। দক্ষিণ কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতেরা পালাতে থাকে। শাহ্ ব্যক্তিগতভাবে কাশ্মীরিয়তের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না। ফলে দক্ষিণ কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এই উদ্বাসন সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে।

দক্ষিণ কাশ্মীরের মিরওয়াইজ, অনন্তনাগের কাজি নিসার, হামিদ শেখ, আশফাক মজিদ ওয়ানি, জাভেদ মির, ইয়াসিন মালিক প্রভৃতি বিচ্ছিনতাবাদী যুবক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে গোটা উপত্যকা জুড়ে নাশকতামূলক কাজকর্ম ও কাশ্মীরি হিন্দু উদ্বাসনে মদত জোগায়। মজার ব্যাপার হলো, এই শেষোক্ত হিন্দু হত্যাকারী জে কে এল এফের ইয়াসিন মালিক বামপন্থীদের পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেমিনারে এলে তাঁকে 'লাল কারপেট' সংবর্ধনা দেওয়া হয়, অথচ সেখানে জাতীয়তাবাদী কোনো অনুষ্ঠান হলে তা যেনতেন প্রকারে ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়। আর যারা এই ভণ্ডুল করাতে নেতৃত্ব দেয় তাঁরা সবাই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতোই মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মার খেয়ে, সর্বস্য খুইয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু বা তাঁদের পুত্র-কন্যারা।

যাইহোক, কাশ্মীর উপত্যকায় কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের উপর শেষ অত্যাচারটা নেমে আসে ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯০-এ। এই পর্যায়ের শুরুটা প্রথম করে শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্। শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ইঙ্গিত করে একটি ছড়া চালু করেছিল— 'রলিভ, সালিভ ইয়া গালিভ', অর্থাৎ আমাদের একজন হয়ে যাও, মানে মুসলমান হয়ে যাও, পালাও অথবা জাহান্নামে যাও। কংগ্রেস দলের কাছে এযাবৎ শুনে এসেছি, ইনি নাকি মহান ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন!

১৯৯০-এর ১৯ জানুয়ারির রাত্রি থেকে শুরু হওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিত হিন্দুদের এই অত্যাচারিত হওয়া, তাদের মেয়েদের ধর্ষিত হওয়া, সম্মান খোয়ানো, ত্রস্ত কবুতরের পালিয়ে আসা— একটা প্রবন্ধের পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর যে মনস্তত্ত্বিক চাপ তৈরি করা হয়েছিল তারই কিছু লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। তার আগে বলে নিই, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রভাবশালী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে শেষ করে দেওয়ার এক প্রকল্প নিয়েছিল এই মুসলমান ধর্মান্ধরা।

সেই ঠাণ্ডা, শীতের রাতে কাশ্মীরি হিন্দুরা মসজিদ থেকে ভেসে আসা ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের সেই প্ররোচনাকারী সাম্প্রদায়িক স্লোগানে ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে। এই সময়ে নানাভাবে হত্যা করা হয়েছিল পণ্ডিত সমাজের ভূষণলাল রায়না, মোহনলাল, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নীলকান্ত গঞ্জু, ব্যবসায়ী সতীশ টিক্কু, কাশ্মীর দূরদর্শন কেন্দ্রের নির্দেশক লাসা কাউল, পণ্ডিত সমাজের অন্যতম নেতা অশোককুমার কাজী, নবীন সাপ্রু, টিকালাল তাপলু, কবি সর্বানন্দ কৌল প্রেমী, শিক্ষিকা গিরিজা টিক্কু, শ্রমিকনেতা হৃদয়নাথ ওয়ানচু এবং আরও অনেক কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতকে হত্যা করে মুসলমান উগ্রপন্থীরা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণীয়; এই ধারাবাহিক কাশ্মীরি পণ্ডিত হত্যার সময়েই রাজনৈতিক নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিল। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা জর্জ ফারনান্ডেজ, সিপিএম নেতা হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ প্রমুখ। মজার ব্যাপার হলো, এঁরা বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের রোষ থেকে বাঁচতে জম্মুতে যাননি। কাশ্মীরের কমিউনিস্ট নেতা এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ঋষিদেব তাঁর কেন্দ্রীয় নেতা হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচারের বিষয়টি জাতীয়স্তরে তুলে ধরতে অনুরোধ করেন। উত্তরে সুরজিৎ বলেন, 'অ্যায়সি বাতেঁ চলতি রহতি হ্যাঁয়। 'এই উত্তরটা অনেকটা আমাদের রাজ্যের কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী ও সুরজিতের সহযোদ্ধা জ্যোতি বসুর সেই বহু উচ্চারিত 'এমন তো কতই হয়!'

এখন প্রশ্ন হলো, কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের এই বিতাড়ন কাশ্মীরি উগ্রপন্থী মুসলমানদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত? কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ ড. রজত মিত্র এক যুবতী কাশ্মীরি পণ্ডিতের জবানিতে লিখেছেন, কীভাবে আমরা পুরো পরিবার ১৯৯০-এ দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম উপত্যকা ছেড়ে সেটা আমাদের পরিবারের এক নিশ্চুপ অকথিত অধ্যায়। আমার একটাই প্রশ্ন, আমরা যখন ত্রস্ত কবুতরের মতো পালিয়ে এসেছিলাম তখন আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যবহার কেমন ছিল? মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা চুপ থেকেছেন। আমার মনে হয়েছে, তাঁরা জানতেন কিন্তু বলবেন না। লেখক বলেছেন, তিনি একসময় দিল্লির তিহার জেলে বন্দি কিছু মুসলমান সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ১৯৯০-এর দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়িয়ে তোমাদের কেমন মনে হতো? তাদের একজন বাল্য বয়সের ঘটনা মন খুলে বলেছিল, 'ওঁদের ওই দৌড়ে পালানোটা ছিল বেশ আমোদের বিষয়। ভয় পেয়ে ত্রস্ত পায়রাদের পালানো। দীর্ঘদিন ধরে এটাই ছিল কাশ্মীরিদের কাছে আমাদের বিষয়। যেন চোখের সামনে সার্কাস দেখছি, এই মজাটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে উপভোগ করেছি।' তাঁরা কি আর ফিরে আসবে না? উত্তরে সে বলে আপনার কি মনে হয় আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব?

আপনি কি জানেন, এই পালিয়ে যাবার দৃশ্য দেখার জন্য মা আমাকে নতুন জামাকাপড়ও কিনে দিয়েছিল। আমার এক বন্ধুর বাবা তাকে বাইনোকুলার কিনে দিয়েছিল এই দৃশ্য দেখার জন্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে এই ঘটনা হঠাৎ করে ঘটেনি? —একেবারেই না, এটা পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিল। আমরা সবাই জানতাম, ওইদিন থেকে ওঁরা পালাতে থাকবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকেই ঘটেছিল। এটা সার্কাসের মতো দেখতে যাতে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বলতে পারি কীভাবে বিধর্মী কাফেরদের তাড়াতে হয়। দিনের পর দিন আমরা তাঁদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য মসজিদের মাইক থেকে স্লোগান দিয়েছি— ও জালিমোঁ, ও কাফিরোঁ, কাশ্মীর হামারা ছোড় দো, কাশ্মীর মে আগর রহনা হ্যাঁয়, তো আল্লাহ আকবর কহনা হোগা। অথবা মুসলমানো জাগো, কাফিরো ভাগো।

আরও বলেছি, তাঁদের মহিলাকুলকে রেখে যেতে। এই ভাবে যদি আমরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়া করতে পারি, 'তাহলে বাইরের পৃথিবীর কেউ আমাদের কাশ্মীরি হিন্দুদের গণহত্যার দায়ে দোষারোপ করতে পারবে না।' দেখা যাচ্ছে, ত্রিশ, বত্রিশ বছর পরেও কেউ কাশ্মীরি মুসলমানদের দোষারোপ করেনি হিন্দু গণহত্যার দায়ে। কেউ হিন্দু পণ্ডিতদের মানবাধিকারের কথা উচ্চারণ করেনি। পরন্তু কাশ্মীরি মুসলমানেরা 'ভিকটিম' কার্ড খেলে চলেছে। বলা হচ্ছে, তাদের ফোন লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে ইত্যাদি।

কিন্তু বিবেকরঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ওদের সব পরিকল্পনায় বাধ সেধেছে। পৃথিবীর মানুষের সামনে কাশ্মীর উপত্যকার সত্যিটা পৌঁছে গেছে। মানুষকে আর বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না। আবদুল্লাহ্ পরিবার, মুফতি পরিবার, সৈয়দ আলি শাহ্ গিলানি, ইয়াসিন মালিক ইত্যাদিদের স্বরূপ সামনে এনে দিয়েছে এই চলচ্চিত্র।

এসব দেখে আমাদের হিন্দু বাঙ্গালিদের কি কিছু মনে হয় না। একটা নোয়াখালি ফাইলস, একটা ভৈরব ব্রিজ ফাইলস, একটা কালশিরা ফাইলস অথবা ১৯৪৬-এর কলকাতার উপর একটা কলকাতা ফাইলস কি নির্মিত হতে পারে না! কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি; কিন্তু বিতাড়িত হিন্দু বাঙ্গালির সংখ্যা দেড় কোটির উপরে— এটাও স্মর্তব্য। □

উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সকলকে
নবরাত্রি, শ্রী রামনবমী ও শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

সৌজন্যে : শ্রী কল্যাণ চৌবে
সভাপতি, বিজেপি, উত্তর কলকাতা

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033

Phone :- 24241240/ 7108, M: - 9748571413
E-mail : epc@epcfans.com
Website : www.epcfan.in

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

চিরবসন্তের অগ্রদূত, হে পয়লা বৈশাখ

সুবল সরদার

গগনে পবনে শাখে কোকিল ডাকিছে।
শস্যে ফলে ফুলে বন ভরেছে।
রূপে রসে গন্ধে বাতাস মেতেছে।

সেইজন্য তো এই নদীমাতৃক রূপসী বাঙ্গলায় পয়লা বৈশাখের আগমন। বাঙ্গালির আবেগের নাম তো পয়লা বৈশাখ। ১ জানুয়ারি কখনোই তার বিকল্প নয়। সে কেবল কার্নিভালের (পশ্চিমিদের পানাহার-সহ মত্ত উৎসব) মতো আনন্দমুখর। পয়লা বৈশাখ মানে নতুনের ডাক। স্বপ্নের হাতছানি। পয়লা বৈশাখ মানে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের পালা। সবুজ বরণ। নতুনের আহ্বান। রূপসী বাঙ্গলা রূপে, রসে গন্ধে ভরে ওঠে এই বৈশাখে। এতো সাজে, এতো রূপে সে অপরূপা হয়ে ওঠে। রূপে, রসে, গন্ধে সে লাস্যময়ী। ফুলে ফলে সে শস্যশ্যামলা। নদীমাতৃক বাঙ্গলা এ কী অপরূপ সাজে কল্যাণীয়া হয়ে সে সর্বত্র বিরাজমান। কমলেকামিনীর তো এমন রূপ হয়! বর্ষার বাদলধারা, শরতের আকাশে মুক্তির ডাক, হেমন্তের শিশিরভেজা ঘাস! তবুও তারা যেন ঋতুরাজ বসন্তের প্রজা। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে যায় পয়লা বৈশাখের ভালোবাসা।

এসময় প্রকৃতিও নতুনত্বের আনন্দে মেতে ওঠে। তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ সর্বত্র। বসন্ত আসে। কোকিল ডাকে। মনে হয় কত চেনা সেই মিষ্টি সুর। কচি, সবুজ পাতা ফুরফুরে বাতাসে ডানা মেলে স্বপ্ন দেখে। দখিনা বাতাস মুক্তির গান গায়। অসীম নীল আকাশে আছে শুধু শান্তির বার্তা। নদী ভালোবাসার গান ধরে। পাহাড় বন্ধুত্বের ডাক দেয়। বন বনময়ূর হয়ে পেখম তুলে নাচে, এ যেন স্বর্গে ইন্দ্রের মজলিস বসেছে। পয়লা বৈশাখের ডাকে একবার ফিরে আসতেই হয় এই রূপসী বাঙ্গলায় মাতৃদর্শনে। এ মাটির ঋণ কেউ কখনো শোধ করতে পারে!

যা কিছু পুরাতন, জরাজীর্ণ বৈশাখের স্পর্শে চির নতুন, চির সবুজ হয় নবীন বরণের মধ্যে দিয়ে। কিশলয়ের জন্ম হয় ঝরা পাতার বিদায় দিয়ে। এ পতন বিষাদ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। পয়লা বৈশাখ নতুন করে শপথ নেবার দিন। পয়লা বৈশাখের রীতি অনুযায়ী বন্যদের রক্ষার জন্যে ওইদিন সকালে গোমাতার পুজো দেওয়া হয়। পশুরা বনে সুন্দর, শিশুরা মায়ের কোলে— এই সুন্দর সনাতনী চিন্তার জন্ম এই বাঙ্গলায় যা বর্তমানে পশু সুরক্ষা আইনে পরিবর্তন হয়েছে। তুলসীগাছে ঝারা (জল) দেওয়ার রীতি বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথি থেকে, যা অন্যভাবে বলা যায় গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। বৃক্ষ বাঁচানোর এই মূল মন্ত্র বাঙ্গলার সনাতনী এই রীতিনীতি। এই দিন ভূমিমাতা গর্ভ ধারণ করে— এই ভাবনাতে ভূমিতে সকালে খড়ের আগুন জ্বালানো হয় যা বর্তমানে বসুন্ধরা সম্মেলন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বাঙ্গলার এই সনাতনী রীতিনীতিগুলো আধুনিক বিশ্বের পথপ্রদর্শক। আমাদের সনাতনী ভাবনা আজকের আন্তর্জাতিক ভাবনা। গ্রাম বাঙ্গলার এই চিরন্তনী রীতিনীতি বিশ্ব বাঁচানোর চাবিকাঠি। এই মুক্তির পথ শুধু বাঙ্গলা কিংবা ভারতের নয় এখন সারা বিশ্বের মুক্তির পথ। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্ব, আনন্দের কথা।

ঋতুমাসের ঋতুকথা মানে তো ব্রত আর উৎসব। বৈশাখের বরণ উৎসব শুরু হয় উৎসবমুখর চৈত্রের শেষে। ভরা যৌবনের প্রতীক পয়লা বৈশাখ কোকিলের মতো কেবল ঋতুরাজ বসন্তের দূত হয়ে আসে না, উৎসবের দূতও হয়ে আসে। পয়লা বৈশাখের আগেও রূপসী বাঙ্গলা উৎসবমুখী হয়ে ওঠে। নীল, চড়ক থেকে শুরু করে পয়লা বৈশাখ, গোষ্ঠমেলা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, অক্ষয় তৃতীয়া। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় গোষ্ঠ মেলার রসাস্বাদন। তাকে কেন্দ্র করে আমাদের অনন্ত জীবনের পরিক্রমা। শাশ্বত প্রেমলীলার সর্বজনীন আবেদন।

পুরাতনের সঙ্গে নতুনের কোনো সন্ধি নয়। কী ছিল, কী পাইনি তার হিসেব নিয়ে এখন দুঃখ নয়। এখন কী পাব তার স্বপ্নে আমরা মশগুল। বৈশাখের প্রেমে ঋতুরাজ বসন্ত কোকিলের ডানায় চেপে বঙ্গ বিজয় করে ওড়ায় বিজয় কেতন। রূপসী বাঙ্গলার সারা অঙ্গে গন্ধে লেগেছে অভ্র মাখানো রূপের লাবণ্য, নববধূর মতো লজ্জার ঘোমটা জড়ানো। পয়লা বৈশাখ সুন্দর জীবনের অঙ্গীকার। বাড়িতে আলপনা এঁকে, শাঁখ বাজিয়ে পয়লা বৈশাখকে সাদর স্বাগত জানাতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এক লহমায় কী যাদু বলে আমরা কেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠি! হোলির মতো বৈশাখে প্রকৃতিও রং নিয়ে আসে। নানা রঙে বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের সুর বাজে। শাশ্বত জীবনের চিরন্তন প্রেমগাথা। পয়লা বৈশাখ তাই বাঁচার প্রেরণা। এগিয়ে চলার নিশানা। বৈশাখ ও বাঙ্গলা পরস্পরের পরিপূরক। মণিহারা ফণির মতো বৈশাখ ছাড়া বাঙ্গলা কখনো হয়! বাঙ্গালির আবেগ, পয়লা বৈশাখ রূপসী বাঙ্গলার এই সোহাগ মাখানো ভাবনাতে আমরা বেঁচে থাকি। পয়লা বৈশাখকে প্রতিবছর ফিরে আসতেই হয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো রূপসী বাঙ্গলার প্রেমে। তাই আকাশ, বাতাস, নদী, মাঠ, পথ, ঘাট, পাহাড়ে, বনে বনে আলপনা এঁকে তার সাদর অভ্যর্থনা। অশোকবন থেকে পলাশ, পাকুড়ের পাপড়ি খসা লাল পথ ধরে আবার এসো কোকিল কণ্ঠী চিরবসন্তের অগ্রদূত, হে পয়লা বৈশাখ।□

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

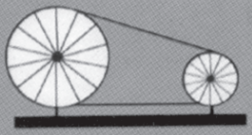

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

টুইটার বিতর্কের মাঝে দিশা দেখাচ্ছে দেশীয় 'কু'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আপত্তিকর টুইটার অ্যাকাউন্ট কেন বন্ধ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে মার্কিন মাইক্রো ব্লগ সংস্থাকে জবাব দিহি করেছে। ভারতীয় ভাবাবেগ ও সংস্কৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকায় বারবার টুইটার বিতর্ক উঠে আসছে বলে ধারণা তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। এই বিতর্কের মাঝেই দেশীয়

প্রযুক্তি নিয়ে দারুণ সাফল্য পাচ্ছে ভারতীয় মাইক্রোব্লগিং সাইট 'কু'। কু-র সিইও অপ্রমেয় রাধাকৃষ্ণও মনে করেন টুইটার নিয়ে বিতর্ক অনেক গভীরে গাঁথা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য সম্ভব। আর সেই বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা আমাদের মাইক্রোব্লগিং সাইটটি ডেভেলপ করেছি। আমাদের বিশ্বাস, আমরা দেশের মানুষের আলোচ্য বিষয় যতটা ভালো বুঝি, সেটা কোনো বিদেশি সংস্থা বুঝবে না। তাই কু-এর প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের আপত্তিকর বিষয় নিয়ে বিতর্কের সুযোগও খুব একটা নেই। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে 'কু' যথেষ্ট সচেতন। আঞ্চলিক ভাষাও কু-তে প্রাধান্য পায়। দিনে দিনে কু-তে আঞ্চলিক বিষয়ে পোস্টের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পূর্বভারতেও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে কু। পাশাপাশি কমছে টুইটারের ব্যবহার। কু-এর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের ধারণা আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে ভারতের ১০০ মিলিয়ন মানুষ কু-এর মাইক্রোব্লগিং সাইট ব্যবহার করবে।

অদূর ভবিষ্যতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় প্রকল্প নিয়ে আসছে কু। সিইও অপ্রমেয় কৃষ্ণ জানিয়েছেন, এবার তারা অর্থকরী বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। কু-এর কোনো ব্যবহারীর পোস্ট যদি জনপ্রিয় হয়, প্রচুর মানুষ যদি তা শেয়ার করেন, তাহলে ওই ব্যবহারকারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট ছবি বা ভিডিয়ো পোস্টের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাবেন। যেমনটা ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে হয়ে থাকে।

চালু হলো কর সংক্রান্ত নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নতুন অর্থবর্ষের প্রথম দিন থেকেই আর্থিক লেনদেন ও কর সংক্রান্ত নতুন নিয়ম চালু হলো। এর মধ্যে রয়েছে ইপিএফের সুদ, টিডিএস ও ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত নতুন বিধি।

এবার থেকে রিটার্ন ফাইলের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হলে শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাবেন আয়কর দাতারা। রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কোনো আপডেট করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষ শেষের দু' বছরের মধ্যে তা করা যাবে। ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে প্রাপ্ত সব রকম লাভের উপর ৩০ শতাংশ কর লাগু হয়েছে। নতুন নিয়ম জারি হলো ইপিএফের ক্ষেত্রেও। এখন থেকে দু' ধরনের অ্যাকাউন্ট চালু করছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)। আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত কমট্রিবিউশানের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট করহীন থাকবে, তার বেশি হলে সেই অ্যাকাউন্ট করহীন থাকবে না। নিয়মে বদল হচ্ছে শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও। এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র লংটার্ম ক্যাপিটাল গেন-এর জন্য সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ সারচার্জ বহাল ছিল। এবার থেকে তা প্রযোজ্য হবে সব ক্ষেত্রেই। নতুন নিয়মে এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মতো রাজ্য সরকারের কর্মীরাও ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের (এনপিএস) অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

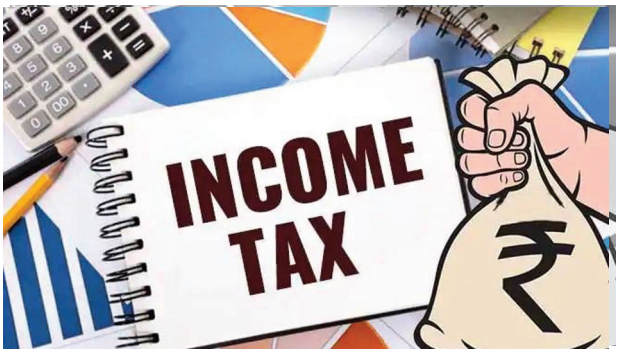

নতুন অর্থবর্ষে ৭৫ বা তার বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিকদের আয়কর রিটার্ন ফাইল করতে হবে না।

এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাঙ্কে একটি ঘোষণাপত্র জমা করতে হবে। গৃহ ঋণে ৪৫ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রথমবার কেনা সম্পত্তিতে সুদের হারে অতিরিক্ত আড়াই লক্ষ টাকা পাওয়ায় সুবিধা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

With Best Compliments From :

সকলের জন্য রহিল
বাংলা শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে ঃ-
Ram Chandra Agarwal
Advocate

With Best Compliments From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,
1st Floor, Kolkata 700 001
Ph. +91 33 2248 1789/ 1790
Email : leadstone.intl@gmail.com

With Best Compliments From :-

Rajesh Kankaria

AJAY APPARELS

Office :
155B, Rabindra Sarani
3rd Floor,
Kolkata-700007
Ph. 033-2272 7030